সুকুমারী

সুকুমারী

(উপন্যাস)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
১৩২৮

মূল্য ১৮০

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

SONS

প্রিণ্টার- শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।
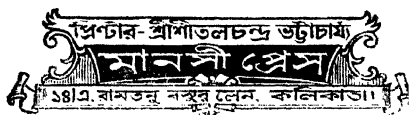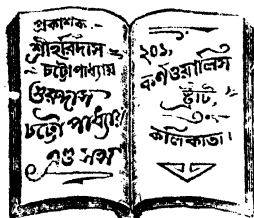
আত্মকথা

পাঠক-পাঠিকাগণকে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। এই ক্ষুদ্র উপন্যাস মধ্যে বিধবার বিবাহসম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা আমার মতামত নহে; তাহা উপন্যাসের পাত্র পাত্রীগণের মতামত মাত্র। জ্ঞানী ও বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল সমীচীন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি অবনত মস্তকে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আশ্রম, হুগলি।
১৫ই আশ্বিন, ১৩২৮।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

পূর্ণিমা—চারিটি ছোট উপন্যাস একত্রে—মূল্য ১।০

মানদা—গার্হস্থ্য উপন্যাস ঐ ১৸০

অপরাজিতা— ঐ মূল্য ২৲

পঞ্চক—গল্পগ্রন্থ—(যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুকুমারী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোগ-শয্যায়।

ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া চলিয়া গেলেন।

সোপানাবলীতে ডাক্তারের পদশব্দ বিলীন হইলে, সুকুমারী রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমাকে দেখে ডাক্তার কি ব'লে গেলেন?"

শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত বি-এ ব্রাহ্ম-কন্যা। মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত ব্যারিষ্টার ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী সুকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং তাহাকে মিসেস গুপ্ত আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিবাহের পর দু: বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল।—সুকু ভূত প্রেমদানে স্বামীকে পরিতুষ্ট রাখিয়াছিল; মিঃ এন্, বি, গুপ্ত যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন দ্বারা প্রেমময়ী প্রণয়িনীর প্রণয়োৎস সজীব রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষকে চিরসুখী করা করুণাময় ভগবানের বিধান নহে; বুঝি শান্তির ছায়া কত মিষ্ট তাহা মানুষকে বুঝাইবার জন্য, ভগবান তাহাকে বিপদের তপ্ত রৌদ্রে তাপিত করেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে মিঃ গুপ্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। সুকুমারী আপন সঞ্চিত সমুদয়

অর্থ ব্যয় করিয়া স্বামীর চিকিৎসা করাইল, স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অহরহঃ অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা করিল; মূল্যবান বিলাতি পথ্য ক্রয় করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল। অবশেষে রোগের কিছু উপশম হইল। কিন্তু এখনও মিঃ গুপ্ত শয্যাগত, এখনও প্রত্যহ ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যান।

সুকুমারীর প্রশ্ন শুনিয়া, মিঃ গুপ্ত তাহার ম্লান মুখের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "বোস'; আমার কাছে একটু ব'সবে না?"

সুকুমারী স্বামীর শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিল; এবং স্বামীর রোগশীর্ণ করতল আপন যৌবনপুষ্ট সুকোমল করতল মধ্যে আদরে গ্রহণ করিয়া আবার প্রশ্ন করিল, "ডাক্তার কি বলে গেলেন?"

অনন্তশয্যাশায়ী মহাবিষ্ণুর পদতলোপবিষ্টা বিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় কান্তার অনবদ্য মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে মিঃ গুপ্ত কহিলেন, "বলে গেলেন যে আর আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। এখন চার পাঁচ সপ্তাহ জাহাজে চড়ে সমুদ্রবায়ু সেবন করে ঘুরে বেড়াতে পারলেই শরীরটা সেরে যাবে।"

সুকুমারী। তা তুমি এক কায কর না।—শরীরে একটু বল পেলেই, কলকাতা থেকে কোন জাহাজে চড়ে এডেন পর্য্যন্ত যাও। আবার এডেন থেকে অন্য জাহাজে চড়ে কলকাতায় ফিরে এস। তাহলেই তোমার পাঁচ ছয় সপ্তাহ সমুদ্র বায়ু সেবন করা হ'বে। আর ভারতের তীরে তীরে এডেন পর্য্যন্ত গেলে, আর এক সুবিধে

আছে। জাহাজে তোমার যদি কোনও অসুবিধা বা অসুখ হয়, তুমি মান্দ্রাজে বা অন্য কোন বন্দরে নেমে তৎক্ষণাৎ রেলপথে বাড়ী ফিরে আসতে পারবে।

মিঃ গুপ্ত। কিন্তু জাহাজে চড়ে এডেন পর্য্যন্ত যেতে হ'লে অনেক টাকার দরকার। আমার এই ব্যরামে সর্ব্বস্ব ব্যয় হ'য়ে গেছে ; এখন এত টাকা কোথা পাব ? তোমার হাতে যে টাকা ছিল, তা তুমি সব খরচ ক'রেছ। তোমার গায়ের গহনা গুলিও একটি একটি ক'রে বিক্রি ক'রে আমার চিকিৎসার ব্যয় বহন ক'রেছ। আর তুমি কত সহ্য ক'রবে ? আমার মত অপদার্থ স্বামীর জন্যে কোন স্ত্রীই তোমার মত গায়ের গহনা খুলে দেয় না।

সুকুমারী। ছি! ও কথা বলতে নেই। তোমার জন্যে আমি যা ক'রেছি, তা সকল স্ত্রীই ক'রে থাকে। আমি নতুন কিছু করিনি।

মিঃ গুপ্ত। দেখ সুকু, এই রোগশয্যায় পড়ে আমি এক এক বার ভাবি যে, রোগের প্রথম অবস্থাতেই আমি যদি মরতে পারতাম, তাহলে তোমার যথার্থ সুখের ব্যবস্থা হ'ত।

সুকুমারী স্বামীর বাক্যে ব্যথিত হইল। ক্ষুন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এমন কথা ভাব ?"

মিঃ গুপ্ত। যদি আগেই মারা যেতাম, তাহলে তোমার টাকা আর গহনা গুলো সব নষ্ট হ'ত না। আর আমার জীবনবীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি পেতে।

সুকুমারী। স্বামীর জীবনের চেয়ে কি টাকা আর গহনা বড় ?

মিঃ গুপ্ত। আমার মৃত্যু হ'লে সেই স্বামী-সুখও তুমি বেশী উপভোগ করতে পারতে। তখন তোমার রুগ্ন স্বামীর পার্শ্বে অহঃরহঃ বিমর্ষ মুখে বসে থাকতে হ'ত না; অর্থকষ্টের মাঝে পড়ে সকল সুখের দ্বার রুদ্ধ করতে হ'ত না। আমাদের সমাজের নিয়মানুযায়ী বিধবা বিবাহ করে, নূতন সুস্থ স্বামীর সঙ্গে পরম সুখে হাসিমুখে দিন কাটাতে পারতে।

প্রায় দুই মাস কাল রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, মিঃ গুপ্তের কথাগুলা কিছু তীব্র হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তিনি সুকুমারীকে যাহা বলিলেন, তাহাতে সে বিলক্ষণ তীব্রতা অনুভব করিল। সে ব্যথাবিকল কণ্ঠে কহিল, "ও সব তুমি কি কথা বলছ? ও সব কথা শুনলে আমার মনে যে কষ্ট হয়, তা কি তুমি বুঝতে পার না?"

মিঃ গুপ্ত। কেন কষ্ট হ'বে? আমাদের সমাজে বিধবা বিবাহের সুবিধান আছে বলেই ত আমাদের সমাজের লোকে শান্তিতে মরতে পারে; মরবার সময় প্রিয়তমা স্ত্রীর ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা চিন্তা করে, তাকে অশান্তিতে মরতে হয় না। বিধবা বিবাহের এই সুবিধান আছে বলেই আমরা ভাবিনে যে আমরা মরে গেলে, আমাদের স্ত্রীরা ভূষণহীনা হ'য়ে আধপেটা খেয়ে, পরের গলগ্রহ হ'য়ে লাঞ্ছনাময় জীবন যাপন করবে।"

আপন পরিণীতা পত্নী পরের গৃহে গৃহিণী হইয়া, তাহার সহিত প্রেমালাপ করিবে, এই মধুর চিন্তা মরণোন্মুখের পক্ষে শান্তিদায়ক

কি না, আমাদের সীমাবদ্ধ উদারতা লইয়া, আমরা তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তোমরা তোমাদের অনন্ত উদার হৃদয় লইয়া, বোধ হয়, মিঃ নীরদবরণ গুপ্তের উক্তির যথার্থতা অনুভব করিতে পারিবে। পারিবে ত?

সুকুমারী কহিল, "আমাদের সমাজটা এখন ইংরাজি সমাজের অনুকরণ হ'য়ে পড়েছে। আমাদের সমাজ এখন বসন-ভূষণ ও আহার ছাড়া আর কিছুর মর্য্যাদা করে না। মনে করে যে আহারের সামান্য পরিবর্ত্তনে বা ভূষণ হীনতায় বিধবাদের মনে কষ্ট হয়। বোঝে না যে এক মনে স্বামীর ধ্যান করতে পারলে, খাওয়ার কথা আর গহনার কথা একটুও মনে থাকে না। নারী-প্রেমের মহত্ত্ব যখন আমাদের সমাজের লোক বুঝতে পারবে, তখন বিধবার গায়ে গহনা পরাবার জন্যে আর তাহাকে পানাহারে পরিতুষ্ট করবার জন্যে চেষ্টা করবে না।"

মিঃ গুপ্ত। আমাদের বিয়ের আগে, তুমি তোমাদের 'স্ত্রী-স্বাধীনতা সভায়' বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলে, তা'তে তুমি কি ব'লেছিলে, মনে আছে?

সুকুমারী। আছে। বলেছিলাম যে সকল বিধবারই পত্যান্তর গ্রহণ করা উচিত। আর যদি কোনও নির্ব্বোধ বিধবা একটা অবাস্তব লজ্জার বশবর্ত্তী হ'য়ে, সহজে আবার বিয়ে ক'রতে না চায়, তাহলে সমাজ জোর করে তার বিয়ে দেবেন; সমাজের বিশেষ করে দেখা দরকার যে সমাজের মধ্যে একটি প্রাণীও যেন, আত্মীয়স্বজনের দুর্ব্বল স্কন্ধের ভার হ'য়ে হীন জীবন যাপন না

করে ; আমাদের সমাজে কেউ যেন হিন্দু বিধবাদের মত দুঃখময় জীবন যাপন না করে !

মিঃ গুপ্ত। তুমি ঠিকই ব'লেছিলে, সুকু।

সুকুমারী। না, প্রাণাধিক, আমি তখন ঠিক কথা বলিনি। ঠিক কথা কাকে বলে, তা' তখন আমি জানতামই না। স্বামীর শুভদৃষ্টির তলে, তখনও আমার প্রণয় কুসুম ফুটে উঠেনি। তোমরা কি বস্তু তা তখন বুঝিনি, তাই তেমন কথা বলতে সাহস করে-ছিলাম। প্রণয়ের বন্ধন যে কত গূঢ়, কত জন্ম জন্মান্তরস্থায়ী, তা তখন জানতে পারিনি, তাই বোকার মত আবলতাবল বকেছিলাম। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি যে যথার্থ প্রেম-বন্ধন ছিন্ন হবার নয় ; তা অনন্তকাল দুটি প্রেমময় হৃদয়কে একসূত্রে বেঁধে রাখে। জ্ঞানময়ী বিধবার অন্য বিয়ে হ'তে পারে না।

মিঃ গুপ্ত বিধবা বিবাহের একজন একাগ্র উপাসক হইলেও, বোধ হয় সুকুমারীর কথায় একটু প্রীতিলাভ করিতে পারিয়-ছিলেন। তিনি হর্ষোৎকর্ষিত কণ্ঠে কহিলেন, "তাহলে, সুকু, আমার যদি কখনও মৃত্যু ঘটে, তাহলে তুমি আর কখনও বিয়ে করবে না ?"

সুকুমারী স্বামীকে এত ভালবাসিত যে, স্বামীর পরিত্যক্ত আসনে অন্য কেহ আসিয়া বসিবে, একথা কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। সে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "কখনও না, কখনও না, কেমন ক'রে তুমি এমন কথা মনে আনতে পার, আমি তা

বুঝতেও পারিনে। তুমি কেমন করে ভাব যে তোমার স্ত্রী তোমাকে ছাড়া কখনও আর কাউকে ভালবাসবে ?"

স্ত্রীর বাক্যে মিঃ গুপ্ত দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, 'না, সুকু, এমন কথা আমি আর কখন ভাববো না ; আমারই প্রাণপিঞ্জরে তোমার প্রেমিক প্রাণ পাখীটিকে আমি চিরকাল পূরে রাখব।'

সুকুমারী কহিল, "বেশ ; আমার প্রেমিক প্রাণ তোমার প্রাণপিঞ্জরে বসে চিরদিন প্রেমের গান গাইবে। জন্ম জন্ম তুমি আমার অনন্যগতি হ'য়ে থাকবে। কোনও জন্মে, এ হৃদয়ে আর কেহ এক কণা স্থান লাভ করতে পারবে না। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক্। এখন বল, তোমার এডেন যাওয়ার কি হ'বে ? কত দিনের মধ্যে তুমি উদ্যোগ করে নিতে পারবে ?"

মিঃ গুপ্ত। উদ্যোগ আমি দুই এক দিনের মধ্যে করে নিতে পারি, কিন্তু টাকা কোথায় ?

সুকুমারী। এখনও আমার টায়রাটা আছে। তুমি বিয়ের রাত্রে সেটা আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলে বলে, আমি মায়ার বশে সেটা এখনও বিক্রী করতে পারিনি। এখন তা বিক্রী করবো। সেটা বিক্রী করলে হাজার বারশো টাকা পাওয়া যা'বে।

মিঃ গুপ্ত। সেটা তোমার পছন্দসই মাথার গহনা, সেটা আমি কখনই বিক্রী করতে দেব না।

সুকুমারী। তুমি আমার মাথার মণি ; তোমার চেয়ে আমার মাথার গহনাটা কখনই বড় হ'বে না। তা' আমি বিক্রী

করবই ; আর সেই টাকা নিয়ে তোমাকে এডেন যেতেই হ'বে।

মিঃ গুপ্ত আর কথা কহিলেন না। কেবল প্রেমপূর্ণ নয়নে প্রেমময়ী পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, এই বিধাতার পৃথিবীতে সুকুমারীর মত বিধবা বিবাহে বীতশ্রদ্ধ কোনও রমণী আছে কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহাজে।

সুকুমারী আপন টায়রা বিক্রয় করিয়া স্বামীকে সমুদ্র-যাত্রায় পাঠাইয়াছিল। নিজেও স্বামীর সহিত আসিবার ইচ্ছা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল; কিন্তু অর্থের অস্বচ্ছলতা বশত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। মিঃ গুপ্তের সঙ্গে গিয়াছিল, এক-জন মাত্র হিন্দুস্থানী বেহারা। সে পুরাতন ভৃত্য; সুকুমারী মনে করিয়াছিল, তাহার দ্বারা সেবা শুশ্রূষার কায সুচারু রূপেই সম্পন্ন হইবে।

প্রায় সারা দিনমান মিঃ গুপ্ত জাহাজের ডেকে বসিয়া সমুদ্রের স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিতেন। কখন কখন সাগরতীর-বর্ত্তী রমণীয় দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে সুকুমারীর অগাধ প্রেমের কথা ভাবিতেন;—তেমন গভীর স্বার্থশূন্য ভালবাসা এ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি? বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে সুকুমারীর শেষোদাহৃত বাক্যগুলি তাঁহার মুগ্ধ কর্ণে মধুপানরত মধুকরের গুঞ্জনবৎ ধ্বনিত হইত।

কথা ছিল যে মিঃ গুপ্ত জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ, মান্দ্রাজ হইতে লঙ্কাদ্বীপের প্রধান বন্দর কলম্বো নগরে, এবং কলম্বো হইতে বোম্বাই নগরে যাইবেন; পরে বোম্বাই হইতে

এডেনে পৌঁছিবেন। এডেন পর্য্যন্ত যাইয়া, সেই পথে, অন্য জাহাজে কলিকাতায় ফেরত আসিবেন। ইহাতে একমাসের অধিক কাল সমুদ্রবায়ু সেবন করিতে পারিবেন। কথা ছিল যে গমন ও প্রত্যাগমন কালে মিঃ গুপ্ত প্রত্যেক বন্দরেই সুকুমারীর পত্র পাইবেন; এবং তারযোগে তাঁহার কুশল-বার্ত্তা সুকুমারীকে প্রেরণ করিবেন।

প্রথম দিন অর্ণবপোতের ডেকের উপর আরাম চৌকিতে বসিয়া মিঃ গুপ্ত দেখিলেন যে, সাগরসঙ্গমে মিশ্রিত গঙ্গার কর্দ্দমময় জল আর দেখা যাইতেছে না। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে, সাগরদ্বীপস্থিত আলোক স্তম্ভের দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে, অনন্ত নীল বারিরাশি দিগন্ত প্রান্তে অনন্ত আকাশের সহিত মিলিত হইয়াছে;—দুইটি সুহৃদের দুইটি অতি উদার হৃদয় যেন আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ রহিয়াছে। পশ্চিমে ধান্যক্ষেত্র ও কদলীবন পরিশোভিত শ্যামতটভূমি যেন অনন্ত নীলিমায় বিভোর হইয়া নীলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তটভূমির পশ্চাতে গাঢ় নীল পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা নীল আকাশকে চুম্বন করিতেছে। —বৃন্দাবনে গোপসুন্দরীদের নন্দনন্দনময় হৃদয়ের ন্যায়, প্রকৃতির প্রেমপূর্ণ হৃদয় যেন নীলিমাময় হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুগণ কেন ভগবানের নীলমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন, প্রকৃতির এই পবিত্র ও অনন্ত নীলিমা নিরীক্ষণ করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

দুই দিন দিবারাত্র ধরিয়া ষ্টীমারখানা ক্রমে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইল। তৃতীয় দিবস দিবাবসানকালে মিঃ গুপ্ত ডেকের উপর

বসিয়া সাগর-বায়ু সেবন করিতেছিলেন ; দূরে ওয়ালটেয়ারের উচ্চ ভূমি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ওয়ালটেয়ারের পর, পর্ব্বত মালার ক্রোড়ে ভিজাগাপত্তম নগরের দূর শোভা দেখা গেল।

ভিজাগাপত্তম দেখিয়া, এক বাল্য বন্ধুর কথা মিঃ গুপ্তের স্মরণ পথে উদিত হইল। এই বন্ধুর নাম প্রাণকান্ত বসু। এই প্রাণ কান্ত আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রাণ। অতএব এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় প্রদান করিব। প্রাণকান্ত বসু ভিজাগাপত্তম নগরে ডাঃ পি, কে, বসু নামে পরিচিত ছিলেন। ডাঃ পি, কে, বসুর পিতা যখন কটকের সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মিঃ গুপ্তের পিতা তখন সেখানে সবজজের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মিঃ গুপ্ত ও ডাঃ পি, কে, বসু উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী পিতার পুত্র এবং কটক কলেজে একত্রে অধ্যয়ন করিতেন। পরন্তু উভয়েই শিক্ষা-লাভ জন্য একত্রে বিলাতে গিয়াছিলেন। এজন্য উভয়ের মধ্যে যৌবন কালে একটা বিশেষ সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পর মিঃ গুপ্ত ব্যারিষ্টার হইয়া এবং ডাঃ পি, কে, বসু ডাক্তার হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। সে প্রায় আট বৎসর আগেকার কথা। তাহার পর এই আট বৎসরের মধ্যে দুই সুহৃদে আর দেখাসাক্ষাৎ ঘটে নাই, কারণ, একজনের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল কলিকাতার হাই-কোর্ট ; অন্য বন্ধু সরকারী চাকুরী গ্রহণ না করিয়া, ভিজাগা-পত্তমে স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে বাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসার দ্বারা স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। ডাঃ পি, কে, বসু বিবাহ করেন নাই ;—রমণী প্রেমে তাঁহার এতটুকু আস্থা ছিল না।

প্রেমিকাগণকে তিনি কুটিলা কুহকিনী মনে করিতেন ;—এই কুহকিনীদের কুহক কুঝটিকা কখনই তাঁহার স্বাধীন পুরুষদৃষ্টি আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, উভয় বন্ধুর মধ্যে পত্র বিনিময় থাকায় মিঃ গুপ্ত এই সকল বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

ডাঃ পি, কে, বসুর কথা ভাবিতে ভাবিতে মিঃ গুপ্ত একবার মনে করিলেন যে ভিজগোপত্তমে নামিয়া বন্ধুর বাটিতে কিয়দ্দিবস আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিবেন ; এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন, যে জাতিকে তিনি কুটিলা কুহকিনী মনে করেন, তাহারাই বরাঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া তন্মূল্যে প্রণয়াস্পদের জীবন রক্ষা করে. তাহারাই শিরোভূষণ বিক্রয় করিয়া স্বামীকে সমুদ্রযাত্রায় প্রেরণ করে ; তাহারাই স্বামীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া, চন্দনানুলেপনবৎ স্নিগ্ধ স্পর্শে স্বামীর রোগতপ্ত তনু শীতল করিয়া দেয়।

কিন্তু মিঃ গুপ্ত নারী মাহাত্ম্য প্রচারের সুযোগ পাইলেন না। ভিজাগাপত্তম নগরে ষ্টীমার ভিড়িবার সম্ভাবনা ছিলনা। তাহা ডল্‌ফিন্‌স্ নোজ (Dolphin's nose) নামক শিলাময় ভূশাখা অতিক্রম করিয়া, দক্ষিণমুখে মান্দ্রাজের দিকে ছুটিল। চতুর্থদিন সন্ধ্যার দীপমালা পরিশোভিত মান্দ্রাজ নগরী দেখা গেল ;—দূর হইতে নগরীর অভিরাম দৃশ্য অবলোকন করিয়া মনে হইল, যেন অন্ধ্রদেশরাণী সন্ধ্যাকালে রত্নালঙ্কার পরিয়া সরিৎপতির পাদ বন্দনা করিতে বসিয়াছেন ; যেন গগনস্পর্শিনী তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাসে অমরাবতীর একাংশ সাগরতটে খসিয়া পড়িয়াছে ; যেন

বঙ্গোপসাগরের সন্ধ্যাকালীন নৃত্য দেখিবার জন্য বিরাট পুরুষ স্বয়ং হাস্য প্রসন্ন মুখে সৈকত ভূমিতে আসিয়া বসিয়াছেন।

মান্দ্রাজ অতিক্রম করিয়া জাহাজে বঙ্গোপসাগরের আর কোন উপকূলে ভিড়িল না; দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইয়া ভারতমহাসাগরে আসিয়া পড়িল; এবং লঙ্কাদ্বিপের দক্ষিণাংশ প্রদক্ষিণ করিয়া কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিল। এখানে কয়লা লইবার জন্য জাহাজ প্রায় এক প্রহর কাল অপেক্ষা করিবে; অতএব মিঃ গুপ্ত জাহাজ হইতে নামিয়া, বন্দরের ডাকঘর হইতে সুকুমারীর পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং তারযোগে তদুত্তর প্রেরণ করিলেন; তৎপরে রাজপথে ভ্রমণ করিয়া কলম্বো নগরটি মোটামুটি দেখিয়া লইলেন।

কলম্বো হইতে জাহাজ উত্তর পশ্চিম মুখে বোম্বাই এর দিকে ছুটিল। বম্বাই হইতে আরব সাগর অতিক্রম করিয়া জাহাজ এডেন বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতায় জাহাজে চড়িয়া, ঠিক অষ্টাদশ দিবস পরে মিঃ গুপ্ত এডেনে পৌঁছিলেন।

এখানে তিনি বাষ্পীয়তরী ত্যাগ করিয়া তীরে অবতরণ করিলেন। এখানেও সুকুমারীর প্রেমপূর্ণ পত্র বোম্বাই পথে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি তাহা বারবার পাঠ করিয়া হৃদয়মধ্যে অমৃতের স্বাদ অনুভব করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যুমুখে ।

উনবিংশ দিবস পরে মিঃ গুপ্ত কলিকাতা—অভিমুখী অন্য ষ্টীমারে চড়িয়া স্বদেশের দিকে ফিরিলেন।

এই কয়েক দিনের সমুদ্রযাত্রাতেই সৈন্ধব জলবায়ুর গুণে মিঃ গুপ্ত যথেষ্ট শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রেমময়ী পত্নীর সুখসন্দর্শন লালসায় তাঁহার মনোমধ্যে প্রীতি সঞ্চারিত হওয়ায়, মলয়সেবিত মহীরুহের ন্যায়, তাঁহার দেহ সত্বর সবল ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ক্ষুধাও বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। মনে প্রফুল্লতা, দেহে স্বাস্থ্য এবং উদরে ক্ষুধা লইয়া মিঃ গুপ্ত বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিলেন। আনন্দময় স্বদেশে ফিরিয়া আনন্দময়ী দয়িতার আলিঙ্গন মধ্যে বদ্ধ হইবার আশায় মিঃ গুপ্তের হৃদয়, কটাহ মধ্যস্থ ফুটন্ত দুগ্ধের ন্যায়, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কি আনন্দ! আর তিন চারি দিন মাত্র অতিবাহিত হইলেই তিনি সুস্থ ও সবল দেহ লইয়া কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আবার ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া, তিনি তাঁহার সর্ব্বসুখদাত্রী সুকুমারীর সুকুমার দেহ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দিবেন। তাঁহার সুকু—তাঁহার সুকুমারী—তাঁহার প্রেমসাম্রাজ্যের দ্বন্দ্বহীনা সাম্রাজ্ঞী—এমন রমণী রত্ন তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজে আর আছে কি? তাঁহার সুকুমারীর মত

কেহ কি অঙ্গের অলঙ্কার একটি একটি করিয়া বিক্রয় করিয়া স্বামীর জীবনরক্ষা করিতে পারে? আর তাঁহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের বিধান প্রচলিত থাকিলেও, তাঁহার সুকুমারীর মত কেহ কি প্রতিজ্ঞা করিতে পারে যে, জীবন থাকিতে সে আর পত্যন্তর গ্রহণ করিবে না? তাঁহার সুকুমারীর মহা স্বার্থত্যাগের কথা ভাবিতে ভাবিতে মিঃ গুপ্তের মনে প্রতীতি জন্মিল যে, বিধবা-বিবাহের বিধানটা অতি ভয়ঙ্কর বিধান!—মৃত্যুর পর তাঁহারই প্রেমময়ী পত্নী আর একজনকে প্রেমবিতরণ করিবে, আর একজনের কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিবে, "ওগো। তোমাকে আমি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি!" উঃ! কি ভয়ানক বিধান! এই বিধানের ধারণা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া, দাম্পত্য জীবনে এতটুকু তৃপ্তি বা শান্তি লাভের আশা থাকে না; ইহা প্রেমিকগণের পক্ষে রুচিকারক নহে; ইহা উদ্যত খড়্গের মত, মাথার উপর থাকিয়া, বার বার স্মরণ করাইয়া দেয় যে, মৃত্যুর পর তাহার একটী আঘাতে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে; স্মরণ করাইয়া দেয়, প্রথম পতিই নারীর অপ্রমেয় অবিচ্ছিন্ন প্রেমের একমাত্র অধিকারী নহেন; অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যকে বিবাহ করিয়া সত্বর পূর্ণাঙ্গিনী হইতে পারেন।

ডেকের উপর আরাম চৌকীতে বসিয়া, হস্তধৃত উপন্যাস পাঠে বিরত থাকিয়া মিঃ গুপ্ত কেবল বিধবাবিবাহের কথা ভাবিতেন। বিধবাদের মৃতপতির চিতা হইতে কৃষ্ণ ধূম উত্থিত হইয়া, তাঁহার হৃদয় গগন মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। সেই মেঘে সুকুমারীর কথা-

গুলা বিদ্যুৎ রেখায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। কি মিষ্ট কথা! বুঝি অমৃত পান করিয়া, অমৃতময় কণ্ঠে সুকুমারী বলিয়াছিল, যে মিঃ গুপ্ত জন্ম জন্ম তাহার অনন্যপতি হইয়া থাকিবেন।

প্রভাতে মানুষ হৃদয়পটে যে সুখ চত্র চিত্রিত করে, সন্ধ্যাকালে চাহিয়া দেখে যে, ভগবানের বিধানে তাহা মলিন হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে যে উজ্জ্বল আশা হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি, সন্ধ্যাকালে দেখি তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। মানবাদৃষ্টের ইহাই বিধান। মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত এই অলঙ্ঘনীয় বিধানের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই।

ডেক হইতে নামিয়া জাহাজের অভ্যন্তরের প্রবেশ কালে পোতাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া মিঃ গুপ্ত জানিলেন যে, আর দ্বাদশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁহারা ভিজাগাপত্তম নগরের নিকটবর্ত্তী হই-বেন। এই সুসংবাদ শুনিয়া, সন্ধ্যাভোজের জন্য বেশ পরিবর্ত্তন করিবার মানসে তিনি আপন ক্যাবিনে প্রবেশ করিলেন। তৎ-কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার হিন্দুস্থানী বেয়ারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তিনি উদর মধ্যে ভার ও বেদনা অনুভব করিলেন; ভাবিলেন আজ সন্ধ্যাভোজে যোগদান না করিয়া, একপাত্র কাফি পান করিয়া, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল। কিন্তু এক গ্লাস হুইস্কি সোডা পান করার পর, তাঁহার উদরের গ্লানি বিদূরিত হইল, এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইল। অতএব তিনি ভোজন কক্ষে যাইয়া ডিনার খাইলেন। ডিনারে সমুদ্র জাত কর্কটের দ্বারা প্রস্তুত একটা খাদ্য

ছিল; উহা মান্দ্রাজী রন্ধন প্রণালী অনুযায়ী প্রচুর চীনাবাদামচূর্ণ সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই খাদ্য খাইতে সুস্বাদু হওয়ায়, মিঃ গুপ্ত কিছু বেশী পরিমাণেই খাইয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহার উদর ভার ছিল; তাহার উপর এই প্রকার গুরু ভোজন হওয়ায়, মধ্যরাত্রে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহাকে পীড়িত দেখিয়া, তাঁহার অনুরক্ত বেয়ারা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল; এবং ষ্টীমারের ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিল।

মিঃ গুপ্ত কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দেখ, বেয়ারা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে আমার কলেরা হ'য়েছে। আমার এ রোগ ভাল হ'বার নয়। যদি ভাল হ'বার হ'ত, তাহলে আমি ক্যাম্ফার আর অন্যান্য ওষুধ যা খেয়েছি তাতেই রোগ কমে যেত। এই কলেরা রোগ বড়ই সংক্রামক। তুমি যদি ষ্টীমারে ডাক্তারকে খবর দাও, তাহলে সে এসে কি করবে, জান? জাহাজের অপর অপর যাত্রীকে রক্ষা করবার জন্যে আমার শরীরের এই কষ্টের দিকে লক্ষ্য না ক'রে, এই রাত্রে, এই অন্ধকারে, এখনই আমাকে এক খানা বোটে ক'রে তীরে নামিয়ে দেবে; হয়ত জীবন্ত অবস্থাতেই আমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেবে। তুমি ডাক্তারকে খবর দিওনা। ডাক্তার এসে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করত তা' ত আমি নিজেই করেছি; যদি ভাল হই, তাতেই হব। কিন্তু এ রোগ ভাল হ'বার নয়। আমার মনে হয়, এই রাত্রি শেষ হ'বার

আগেই এই পৃথিবীর সঙ্গে আমার দেনা পাওনা শেষ হ'য়ে যাবে। উঃ! কি যন্ত্রণা!"

প্রভুর বেদনাবিকৃত মুখের দিকে বেয়ারা বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মিঃ গুপ্ত বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন, "বড় যন্ত্রণা! পা'টা টেনে ধর, ভয়ানক খাল ধরেছে;—বুঝি ভেঙ্গে যাবে।"

পুরাতন ভৃত্য অশ্রুপূর্ণ লোচনে পীড়িত প্রভুর সেবা করিল।

কিছু সুস্থ হইয়া মিঃ গুপ্ত আবার বলিলেন, "দেখ, বেয়ারা, আমার মৃত্যুর পর তুমি বাড়ীতে গিয়ে আমার মৃত্যুসংবাদ দিও। আর কাগজ পেন্সিল দাও, দেখি যদি একখানা পত্র লিখ্‌তে পারি।"

বেহারা লেখনোপকরণ আনিয়া দিল। মিঃ গুপ্ত অতিকষ্টে সুকুমারীকে একখানা পত্র লিখিলেন। এই পত্রে মিঃ গুপ্ত সুকুমারীকে কি বলিয়াছিলেন, তাহা পর পরিচ্ছেদে বিবৃত করিবার কারণ ঘটিবে, এজন্য তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। পত্রখানি ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিয়া মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে মিঃ গুপ্ত কহিলেন, "এই পত্রখানা, আর আমার বাক্সে যে টাকাকড়ি আর দামী জিনিষ আছে, তা এখনই গোপনে তোমার বাক্সের ভিতর রেখে এস। আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত জিনিষ সমুদ্রগর্ভে ফেলে দেবার ব্যাবস্থা হবে; তখন তুমি এই পত্র আর টাকাকড়ি কিছুই তোমার বাক্সে নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ আমার একটি জিনিষও আর কাউকে স্পর্শ করতে দেবে না;

এই পত্রখানা তুমি মেম সাহেবকে দিও; আর টাকাকড়ি তুমি নিজে নিও।

বেয়ারা প্রভুর আদেশানুযায়ী পত্র ও অর্থ আপন পেটকমধ্যে রাখিয়া, আবার তাঁহার নিকট প্রত্যাগত হইল; এবং সারারাত্র বিনিদ্র থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।

প্রভাতে প্রভাতবায়ুর সহিত মিঃ গুপ্তের প্রাণবায়ু মিশিয়া গেল। কয়েক প্রহর পূর্ব্বে যে প্রাণ প্রেম ও আশায় পূর্ণ ছিল, এখন তাহা কোথায়? তোমরা পৃথিবীর মানুষ! তোমরা এ কথার উত্তর দাও। তোমরা বিদ্বান, তোমরা জ্ঞানবান, তোমরা এ কথার উত্তর দাও। ঘড়ীটা চালাইয়া দিয়া আমরা বলিতে পারি যে উহা এত দিন চলিবে; কিন্তু জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়া আমরা বলিতে পারিনা, উহা কোনদিন, কোন মুহূর্ত্তে, কোথায় কিরূপে শেষ হইয়া যাইবে। হায়! অক্ষম, নিরুপায় মানব!

অল্পকাল মধ্যে মিঃ গুপ্তের মৃত্যু সংবাদ জাহাজের কাপ্তেনের কর্ণগোচর হইল। তাঁহার আদেশ মত জাহাজের ডাক্তার মিঃ গুপ্তের ক্যাবিনে আসিয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে কলেরা রোগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখন মিঃ গুপ্তের দেহের সহিত তাঁহার সমুদয় দ্রব্যজাত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন তাঁহার ভৃত্যকে পানসীতে চড়াইয়া ভিজাগাপত্তমের উপকূল ভূমিতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। তখন রোগবীজ সংহারক দ্রব্যের দ্বারা মিঃ গুপ্তের ক্যাবিনটি সাধ্যমত সংশোধিত করা হইল। পোতাধ্যক্ষ তারহীন তারযোগে কলিকাতায় সংবাদ পাঠাইলেন যে,

তাঁহার জাঁহাজে কলেরা রোগ প্রকাশ পাইয়াছে ; এবং মিঃ নীরদ-বরণ গুপ্ত নামক এক প্রথমশ্রেণীর যাত্রী ঐ রোগে মারা গিয়াছেন। কলিকাতার সংবাদ পত্র সমূহ এই সংবাদ দুইদিন পরে কলিকাতায় প্রচার করিল। হাইকোর্টে এই উদীয়মান ব্যারিষ্টারের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল। তাহার পর সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শেষ পত্র।

বেয়ারা ওয়ালটেয়ার রেলষ্টেসানে আসিয়া কলিকাতা অভিমুখী গাড়ী পাইল; এবং যথা সময়ে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল।

স্বামীকে সমুদ্রযাত্রায় পাঠাইয়া সুকুমারী পিতার বাটীতে আসিয়া বাস করিতে ছিল। সুকুমারীর পিতার নাম মিঃ অরুণোদয় দত্ত; তিনি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং এক মাত্র কন্যা সুকুমারী। পুত্রদ্বয় বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে বাস করিতেছিল; সুতরাং সুকুমারীই তখন জনক জননীর সমস্ত স্নেহ একাকী উপভোগ করিয়া লইতেছিল। তখন পিতামাতার স্নেহময় ক্রোড়ে বসিয়া অনতিবিলম্বে স্বামিসন্দর্শনাশায়, তাহার তরুণ হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

ঠিক সেই সময় বেয়ারা মিঃ দত্তের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে সুকুমারীকে মিঃ গুপ্তের শেষ পত্র প্রদান করিল; এবং হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণ করাইল। সে সময় মিঃ অরুণোদয় দত্ত সংবাদপত্র হস্তে লইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সংবাদপত্রের দারুণ সংবাদ বেয়ারা পূর্ব্বেই সুকুমারীকে শুনাইয়াছে, তিনি কন্যার সহিত বাক্যমাত্র বিনিময় না করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন

সুকুমারী বজ্রাহতার ন্যায় কয়েক মুহূর্ত্ত অশ্রুহীন শুষ্কনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর স্বামীর শেষ পত্র বক্ষে ধারণ করিয়া কম্পিত কলেবরে আপন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দিন সে আর জলবিন্দু গ্রহণ করিল না ; শয়ন কক্ষের বাহিরেও আসিল না। কেবল হৃদয় মথিত অশ্রু ঢালিয়া স্বামীর শেষ লিপির পূজা করিতে লাগিল। অশ্রুজল বসনাঞ্চলে মুছিয়া বার-বার পাঠ করিতে লাগিল,—"সুকু, প্রাণাধিকা! আর আমার জীবনের আশা নাই। তোমাকে শেষ দেখা দেখিবার সঞ্জীবনী আশাতেও এ জীবন আর রক্ষা পাইবে না। তুমি আপনার মাথার মুকুট বিক্রয় করিয়া যে জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, বিধাতার একটী কষাঘাতে তাহা মৃত্যুর পথে দ্রুত বেগে ছুটিয়াছে। প্রাণাধিকা, বিদায় দাও। জন্মের মত বিদায় লইবার সময় আমি তোমার নিকট একটি প্রার্থনা করিব, তুমি তাহা শুনিবে ত? আমার মৃত্যু কালের শেষ প্রার্থনা, তাহা কি তুমি শুনিবে না? তুমি আবার বিবাহ করিও। তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আর কখনও বিবাহ করিবে না। কথাটা শুনিয়া, আমি সত্য বলিতেছি, তখন মনে মনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার এই অন্তিম শয্যায় শুইয়া ভাবিয়া দেখিলাম যে, সেটা আমার সংকীর্ণ হৃদয়ের স্বার্থপরতা মাত্র। যথার্থ প্রণয় নিজের প্রীতি বা অপ্রীতির দিকে লক্ষ্য রাখে না। প্রণয় পাত্রীর ভবিষ্যৎ সুখ স্বচ্ছন্দতাই তাহার এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তুমি আমার শেষ

অনুরোধ রক্ষা করিয়া পরলোকে আমার শান্তি আনিও। বিবাহ করিও। এই আনন্দময়ের রাজ্যে চিরদিন শোকের বোঝা মাথায় বহিয়া, আত্মীয় স্বজনের স্কন্ধের ভার হইয়া থাকিও না। বিদায়! প্রাণাধিকা, শেষ বিদায় চুম্বন দাও! কোথায় তুমি? হায়! হায়! কোথায় তোমার বিদায় চুম্বন? আমার তুচ্ছ শেষ অভিলাষ ভগবান পূর্ণ করিলেন না। বিদায়, বিদায়। ইহ জীবনে ও পরজীবনে তোমার চির প্রেমময় নীরদবরণ।"

স্বামীর শেষ আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করিয়া, সুকুমারী বার বার তাঁহার হস্তাক্ষরের উপর চুম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু তদ্দ্বারা মনোমধ্যে এতটুকু শান্তি অনুভব করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে দিবালোক চলিয়া গেল; কাঁদিতে কাঁদিতে নিশার অবসান হইল; কাঁদিতে কাঁদিতে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু সুকুমারীর অশ্রুধারা নিবারিত হইল না। সুকুমারী মনে করিল, তাহার দুস্তর শোক সাগরের অন্ত নাই—তল নাই।

সুকুমারীর পিতা মিঃ অরুণোদয় দত্ত দেখিলেন যে, কন্যা আহার কালে কোনও দিন কিঞ্চিৎ আহার করে, কোনও দিন খাদ্য পাত্রের উপর গণ্ড প্রবাহিত অশ্রুধারা ঢালিয়া অভুক্তাবস্থায় উঠিয়া যায়। রাত্রে অনুসন্ধান লইয়া জানিলেন যে, কন্যা রাত্রে সকল দিন নিদ্রা যায় না; মিঃ গুপ্তের শেষ পত্র বক্ষে স্থাপিত করিয়া উদাস নেত্রে সারারাত কাটাইয়া দেয়। পিতা বুঝিলেন, যে এরূপ ভাবে—অনাহারে ও অনিদ্রায় জীবন অতিবাহিত করিলে

কন্যা কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িবে; তখন তাহার জীবন রক্ষা করা কঠিন হইবে।

একদিন আহার কালে মিঃ দত্ত কন্যাকে আহারে বিরত দেখিয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "সুকু, মা, এমন করলে ক'দিন বাঁচবে, মা?"

রুদ্ধকণ্ঠে সুকুমারী কহিল, "আর আমার বেঁচে দরকার কি, বাবা?"

কন্যার বাক্যে মিঃ দত্তের চক্ষে জল আসিল। তিনি কহিলেন, "বেঁচে যে কি দরকার, তা ভগবান ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের চোখের সামনে তোমাকে ও অনাহারে মরতে দিতে পারিনে।"

সুকুমারী পিতার হৃদয় ব্যথা বুঝিল; এবং কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি করতে বল, বাবা?"

মিঃ দত্ত বলিলেন, "আমার তিন মাস ছুটি পাওনা হ'য়েছে; তার উপর, আর ছ'মাসের ফার্লো নিয়ে, চল, আমরা ইংলণ্ড বেড়িয়ে আসি। সেখানে তোমার ভাইদের লেখাপড়া কেমন হ'চ্চে তা দেখা হ'বে; আর নূতন যায়গায় গিয়ে তুমিও মনে একটা শান্তি পাবে।"

সুকুমারী কহিল, "না, বাবা, আমি এখন এদেশ ছেড়ে, আর কোনও যায়গায় যেতে পারব না। তার চেয়ে, ছুটী নিয়ে তুমি বরং এ দেশেরই নানা স্থানে ঘুরে বেড়াও। হিন্দুদের তীর্থ গুলি দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হয়।"

মিঃ দত্ত বলিলেন, "বেশ, তাই হ'বে। আমরা দুই এক দিনের ভিতরই তীর্থ ভ্রমণে বার হ'ব।"

এ সম্বন্ধে মিঃ দত্ত পত্নীর সহিত পরামর্শ করিলেন। মিসেস্ দত্তও বুঝিলেন যে কন্যাকে বাঁচাইতে হইলে, কলিকাতা ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে যাওয়া দরকার। তিনি বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। পুত্রেরা ইংলণ্ডে ছিল; কাযেই তাহাদের সম্বন্ধে কোনও নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইল না। নয় মাস অকারণ বাড়ীর ভাড়া দিয়া বাড়ীটা, এবং বাড়ী রক্ষার জন্য চাকর বাকর রাখা, মিসেস্ দত্ত সুবিবেচনার কার্য্য মনে করিলেন না। অতএব বাড়ীটা ছাড়িয়া দেওয়া হইল; এবং সমভিব্যাহারে যে সকল ভৃত্য যাইবে, তদ্ব্যতীত অন্য ভৃত্যগণকে বিদায় দেওয়া হইল। তাহার পর শোকসন্তপ্তা কন্যাকে লইয়া মিসেস্ ও মিষ্টার দত্ত ভারতের তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদেশে।

কোথাও শৈলশোভা, কোথাও প্রস্রবণ লীলা, কোথাও নদী সঙ্গম, কোথাও উচ্চ দেব মন্দির দেখিয়া, কোথাও পুণ্যসঞ্চয়াভিলাষীগণের কোলাহল শুনিয়া, কোথাও ব্রহ্মচারী বা অন্য তীর্থ যাত্রীগণের সহিত ধর্ম্ম কথা কহিয়া, সুকুমারী মনোমধ্যে ধীরে ধীরে শান্তিলাভ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দিন তীর্থ পরিভ্রমণের পর সে লক্ষ্য করিল যে, অবিরত নূতন স্থানে যাইয়া, আহার ও নিদ্রার অনিয়মে মিঃ দত্তের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন সুকুমারী পিতাকে বলিল, "চল, বাবা, এখন আমরা কিছুদিনের জন্যে দারজিলিংএ গিয়ে বাস করব।"

অবিরাম রেলযাত্রায়, ক্রমান্বয়ে স্থান পরিবর্ত্তনে মিঃ দত্ত সেই প্রবীণ বয়সে সত্যই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজের ক্লান্তি বুঝিয়া তিনি পত্নী ও কন্যাকেও ক্লান্ত মনে করিয়াছিলেন। তিনি সহজেই কন্যার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিলেন। সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া, তিনি দারজিলিংএ এক বাসগৃহ মনোনীত করিলেন। এবং সকলে তথায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

দার্জিলিংএ তিন মাস অতিবাহিত হইবার পর, শীতঋতুর প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই শীত সহ্য করিয়া,

সেখানে বাস করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল। তখন সুকুমারী বলিল, "চল, বাবা, আমরা সমুদ্রতীরে কোন স্থানে গিয়ে বাস করি।"

মিঃ দত্তের ইচ্ছা ছিল না, যে দারজিলিং হইতে ফিরিয়া, অন্য কোনও স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ছুটির তিনমাস কাল, দারজিলিং হইতে ফিরিয়া, তিনি কলিকাতাতেই কাটাইয়া দিবেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, শীতকালে কলিকাতাতেও প্রচুর স্বাস্থ্য ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু মিসেস্ দত্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে বিদেশভ্রমণে সুকুমারীর বিশেষ উপকার হইয়াছে। তাহার বৈধব্যের প্রথম তীব্র জ্বালা প্রশমিত হইয়াছিল। এখন সে প্রসন্ন মুখে পরলোক-গত স্বামীর নানা গুণের কথা আলোচনা করিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিত; কখনও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর শেষ আদেশের কথা উল্লেখ করিয়া হাসিত। সুকুমারীর এই প্রফুল্লতা দেখিয়া মিসেস্ দত্ত বলিলেন, "না, এখন কলিকাতায় যাওয়া হ'বেনা। যে ক'-দিন ছুটি আছে বিদেশেই কাটিয়ে দিতে হ'বে। যদি দারজিলিং-এর শীত সহ্য না হয়, আমরা সুকুমারীর কথা মত পুরী বা ওয়াল-টেয়ারে গিয়ে বাস করব।"

মিঃ অরুণোদয় দত্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম—কখনও কখনও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারক ও আচার্য্যের কার্য্যও করিয়াছেন; তিনি পৌত্তলিক পুরী পছন্দ করিলেন না। তিনি ওয়ালটেয়ারে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক ব্রাহ্ম বন্ধুকে পত্র লিখিয়া ওয়ালটেয়ারে একটি

বাড়ী ভাড়া লইলেন। পরে পত্নীকে ও কন্যাকে লইয়া ওয়াল-টেয়ারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ওয়ালটেয়ারে যে বাটীতে মিঃ অরুণোদয় দত্ত বাস করিলেন, তাহার অনতিদূরে এক প্রশস্ত রাজপথ ছিল। ঐ সুন্দর রাজপথ ওয়ালটেয়ার হইতে দক্ষিণমুখে সমুদ্রের ধার দিয়া ভিজাগাপত্তন পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পথটি নির্জ্জন। অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত নীল শোভা দেখিয়া, কখনও উত্তাল তরঙ্গমালার ফেনিল মালা দেখিয়া, সুকুমারী প্রায় প্রত্যহ এই নির্জ্জন পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার পিতামাতাও কখন কখন তাহার সহিত এই পথে পরিভ্রমণ করিতেন। যখন সে একাকিনী যাইত, তখন তাহার পিতার বৃদ্ধ বেয়ারা কিছুদূরে থাকিয়া, তাহার অনুসরণ করিত।

ওয়ালটেয়ারে আসিয়া, বারিধির অনন্ত লীলা সর্ব্বদা অবলোকন করিয়া, অতি অল্প কাল মধ্যে সুকুমারী আশাতীত দৈহিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিল দেখিয়া, সুকুমারীর পিতামাতা মনে করিলেন যে এত দিনে তাঁহাদের বিধবাকন্যা স্বামি-বিচ্ছেদ বেদনা ভুলিতে পারিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডাঃ পি, কে, বসু ।

যে দিন প্রভাতে জাহাজের কাপ্তেনের আদেশে মিঃ গুপ্তের দেহ সাগরজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই দিন দিবাবসান কালে নিদাঘের মৃদু অনিল অর্ণবোর্ম্মির সহিত ক্রীড়া করিতেছিল ;—মানবের মৃত্যুর দিন নিষ্ঠুরা প্রকৃতি আপনার নিত্য লীলা টুকু ভুলিয়া যায় না ! সেই দিন বৈকালিক অংশুমালীর অংশুমালা মাখিয়া শ্বেতোজ্জ্বল তরঙ্গ সকল ভিজাগাপত্তমের কঙ্করময় বেলা-ভূমিতে আসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল ; মনে হইতেছিল, যেন প্রেমিক তরঙ্গসকল নগরীর চরণ-প্রান্ত ধরিয়া রজত নূপুর পরাইয়া দিতেছে। পশ্চিমাকাশ হইতে সূর্য্যরশ্মি নামিয়া নীলাম্বুনিধির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আপনার স্বুবর্ণ কর বুলাইয়া দিতেছিল ;—মনে হইতেছিল, যেন বিষ্ণুপ্রিয়া, বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়া অনন্তশয্যায় শয়ান মহাবিষ্ণুর পদসেবা করিতেছেন। সাগর সৈকত বাসী শ্বেত-পতত্রীগণ সারি বাঁধিয়া উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধে উড়িয়া বেড়াইতেছিল ;—মনে হইতেছিল, মেদিনী যেন শ্বেতপুষ্পের মালা গাঁথিয়া, নীলাকাশকে উপহার পাঠাইয়াছেন। দূরে দূরে মৎসজীবি-গণের মসীময় নৌকাগুলি কৃষ্ণপক্ষ হংসের ন্যায় সাগরতরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় নাচিয়া বেড়াইতেছিল। অতিদূরে চক্রবাল প্রান্তে অতি মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বর্ণ সকল আপনাদের অভিনব অভিনয় দেখাইতেছিল।

ভিজাগাপত্তমের বেলাভূমিতে একটা উপলখণ্ডে উপবেশন করিয়া ডাঃ পিঃ, কে, বসু উপরিউক্ত মনোজ্ঞ দৃশ্যসকল উপভোগ করিতেছিলেন। ডাঃ পি, কে, বসুর কথা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অদ্ভুত বিদ্বেষের কথাও উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার সহিত আমরা আরও একটু পরিচিত হইব।

সাগরতীরে বসিয়া অপার নৈসর্গিক শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহসা ডাঃ বসুর কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি বালুকার উপর শায়িত একটা শ্বেত পদার্থের দিকে অকৃষ্ট হইল। দূর হইতে তাহার মনে হইল, যেন কোন শ্বেত পরিচ্ছদধারী ইংরাজের মৃতদেহ তটভূমিতে শায়িত রহিয়াছে। তিনি নিকটে যাইয়া দেখিলেন, যে উহা মৃতদেহ বটে, কিন্তু উহা ইংরাজের দেহ নহে; উহা কোন বিলাতী সজ্জা-পরিহিত বঙ্গ সন্তানের মৃতদেহ। আরও নিকটে যাইয়া অবয়বটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল, যে উহা তাঁহার বাল্যবন্ধু নীরদবরণ গুপ্তের দেহ।

ডাঃ বসু আট বৎসর কাল মিঃ গুপ্তকে দেখেন নাই। আজ আটবৎসর পরে হঠাৎ কিরূপে বন্ধুর দেহটা তাঁহার দৃষ্টিতলে আসিয়া পড়িল, তাহা তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। বিস্ময়ে ও সন্দেহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিরূপে কলিকাতার ব্যারিষ্টার ভিজাগাপত্তমের তটভূমিতে আসিয়া শয়ন করিল? উহা সত্যই কি তাঁহার বাল্য বন্ধুর দেহ? একটু বিশেষ ভাবে চিনিবার জন্য ডাঃ বসু আপন মুখ আনত করিয়া বন্ধুর

মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল, যেন বন্ধুর চক্ষুপল্লব ঈষৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল যে, মিঃ গুপ্তের প্রাণান্ত হয় নাই। তিনি পকেট হইতে বক্ষঃপরীক্ষার যন্ত্র লইয়া বন্ধুর হৃদয় পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, এখনও সেই বক্ষঃমধ্যে জীবনের ক্ষীণকণা বিদ্যমান আছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সাগরতীরবর্ত্তী এক রাজপথের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই রাজবর্ত্মে ডাঃ, পি, কে, বসুর মোটরগাড়ী দণ্ডায়মান ছিল। তিনি দ্রুতপদে সোফারকে ডাকিয়া আনিলেন; এবং তাহার সাহায্যে অতি যত্নের সহিত বন্ধু দেহ মোটরগাড়ীতে উঠাইলেন। পরে মন্থরগতিতে শকটচালনা করিয়া আপন প্রশস্ত ভবনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সেখানে মিঃ গুপ্তের সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দশ বারদিন মৃত্যুর সহিত অহরহঃ দ্বন্দ্ব করিয়া মিঃ গুপ্ত জ্ঞানলাভ করিলেন। ক্রমে তিনি আপন পুরাতন বন্ধুকে চিনিলেন; এবং তাঁহার নিকট আপন মৃত্যুবিবরণ বিবৃত করিলেন। আরও দুই এক দিন পরে তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বন্ধুর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

একদিন মিঃ গুপ্ত ডাঃ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল তুমি আমার শ্বশুর মশাইকে যে টেলিগ্রাম করেছিলে, তার কি কোনও উত্তর পেয়েছ?"

ডাঃ বসু। "তুমি ব্যস্ত হ'য়োনা; উত্তর ঠিক সময়েই আসবে।"

মিঃ গুপ্ত। ব্যস্ত হবার একটু কারণ আছে।

ডাঃ বসু। কি?

মিঃ গুপ্ত। তুমি জান না যে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি আমার স্ত্রীকে একটা ভয়ানক অনুরোধ ক'রেছিলাম।

ডাঃ বসু। কি? আত্মহত্যা হ'য়ে স্বর্গে তোমার সঙ্গে মিলিত হ'বার উপদেশ দিয়েছিলে নাকি? তোমার ভয় নেই, সেকালে অশিক্ষিতা মেয়েরাই সহমরণে মরতো। এখনকার শিক্ষিতা সভ্য নারীরা স্বামীর উদ্দেশে প্রাণত্যাগ ক'রে না। এরূপ কাযকে তাঁরা বর্ব্বরতা মনে করেন। ভয় নেই, তোমার শিক্ষিতা স্ত্রী তোমার কথায় এরূপ বর্ব্বরতা কর্ব্বে না। বরং সুযোগ ঘটলে সুবুদ্ধি প্রেমিকার ন্যায় আর একটা বিয়ে ক'রবে।

মিঃ গুপ্ত। আমার শেষ চিঠিতে আমি সেই অনুরোধই ক'রেছিলাম।

ডাঃ বসু। এমন পাগল ত কখনও দেখিনি। যে সমাজে বিধবার বিয়ে চলিত আছে, সে সমাজের মেয়েদের কি আবার বিধবা-বিবাহের জন্য অনুরোধ ক'রতে হয়? তারা আপনা হ'তেই ছুটে গিয়ে, নূতন পতির গলায় মালা পরিয়ে দেয়।

মিঃ গুপ্ত। আমার স্ত্রীকে তুমি জান না। সে ওকরম ধরণের মেয়ে মানুষ নয়।

ডাঃ বসু। সকল মেয়ে মানুষের ধারাই এক। তবে যা'দের পোষাকের উপর ঝোঁক আছে, তারা বিয়ে ক'রতে কিছু দেরী করে; স্বামীর মৃত্যুর পর দিন কতক কাল বা সাদা শোকপরিচ্ছদ

পরবার সখটা মিটিয়ে নেয়। তবে তোমার স্ত্রী কি করবেন, তা বলা যায় না। তোমার শেষ অনুরোধের আজুহাত দেখিয়ে চট্‌করে একটা বিয়ে করলেও করতে পারেন। তুমি এমন অনুরোধ কেন করলে?

মিঃ গুপ্ত। এই অনুরোধের একটু কারণ ছিল। সমুদ্র-যাত্রায় যাবার আগে, এক দিন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কথা কয়েছিলাম। সেদিন সে জোরের সহিত বলেছিল যে বিধবার বিয়ে কোনমতেই হ'তে পারে না; আর সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকলেও, সে কখন অন্য পতি গ্রহণ করবার কথা মনেও আনতে পারবে না। মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আমার সেই কথাটা মনে পড়ল। ভাবলাম আমার মৃত্যুর পর, বৈধব্য দশায় তার কি কষ্টই ভোগ করতে হবে। যাকে ভালবাসি তার ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা ভেবে মনে বড় কষ্ট হল। তাই শেষ পত্রে বিয়ে করবার জন্যে তাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলাম।

ডাঃ বসু। বেশ করলে! এখন বেঁচে উঠে পত্নীর ভবিষ্যৎ সুখটা স্বচক্ষে দেখো। দেখো, যে তোমার মৃত্যুকালের শেষ প্রার্থনার দোহাই দিয়ে, একটী নবীন পতির হাত ধরে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন; আর অতি হৃষ্টচিত্তে তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন বীমার উপসত্ব উপভোগ করছেন। দেখে, ধন্য হয়ো।

মিঃ গুপ্ত। কিন্তু আমার স্ত্রীকে তুমি জান না। তার মত

পতিভক্তি তুমি কখনও দেখনি। সে কখনই আর বিয়ে করবে না।

ডাঃ বসু। সকল স্ত্রৈণ লোকের ঐ এক বুলি আমি ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করি, যাঁর এতটা পতি-ভক্তি, তিনি কি করে প্রাণপতির শেষ প্রার্থনা-উক্তি লঙ্ঘন করবেন? লঙ্ঘন করে জনসমাজে ত মুখ দেখাতে পারবেন না।

মিঃ গুপ্ত। তামাসা রাখ। আমার স্ত্রীর মত সাধ্বী-নারী বিয়ে না করেও আমার আদেশ পালন ক'রতে পারবে।

ডাঃ বসু। তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মিঃ গুপ্ত। পবিত্র নারীপ্রেমের উচ্চমর্ম্ম তুমি কখনই বুঝতে পারলে না।

ডঃ বসু। খুব বুঝেছি। বুঝেছি বলেই ত তাঁদের প্রেমের ফাঁদে কখনও পা দিইনি। তাঁদের কটাক্ষবাণ কখনও এই কঠিন হৃদয় বিদ্ধ করে নি। বিয়ে হয়নি বলে, সত্যি বলছি, ভগবানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস জন্মেছে; বুঝেছি, মানুষের একজন রক্ষা-কর্ত্তা আছেন, তিনি বাঘিনীদের কবল থেকে আমাকে রক্ষা করছেন।

মিঃ গুপ্ত। আমার স্ত্রীকে যখন তোমার এই কথা গুলো শোনাব, তখন তোমার কি সাজা হবে দেখবে। তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুমি এই মনোমোহিনীদের বাঘিনী বল।

ডাঃ বসু। 'দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী পলক পলক লেহু চোষে, দুনিয়া সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।'

মিঃ গুপ্ত। জেনো, আমি তোমারই যত্নে প্রাণ পেয়ে, তোমাকে এক বাঘিনীর হাতে সমর্পণ করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবো।

ডাঃ বসু। তোমার যত্ন বিফল হবে, ভাই! এই গাণ্ডারের চামড়ায় ঐ বাঘিনীদের নখ কখনও বসবে না।

মিঃ গুপ্ত। নখ না বসুক্। তাঁদের দাসত্ব শৃঙ্খলে একদিন তোমাকে বদ্ধ হতেই হবে।

ডাঃ বসু। 'দাসত্ব শৃঙ্খল, বল, কে পরিবে পায় রে কে পরিবে পায়।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমস্যা।

প্রকাশ্যে মিঃ গুপ্ত পত্নীর প্রগাঢ় পতিভক্তি সম্বন্ধে ডাঃ বসুর নিকট যাহাই প্রকাশ করুন, তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটা আশঙ্কার মেঘ ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল। তাঁহার পতিপরায়ণা সুকুমারী, পতি আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপাল্য, ইহা মনে করিয়া যদি সত্যই তাঁহারই মৃত্যুকালের আদেশ পালন করিয়া অন্যের সহিত বিবাহিতা হয়, তাহা হইলে, তিনি আইনের বলে সেই নূতন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু—কিন্তু অন্যের শয্যাশায়িনী স্ত্রীকে কিরূপে আবার আপন শয্যায় স্থান প্রদান করিবেন? আবার তাঁহারই আদেশ প্রতিপালনের অপরাধে কিরূপে নিরপরাধা সুকুমারীকে জন্মের মত ত্যাগ করিবেন? সুকুমারী বিবাহিতা হইলে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না, আর সেই অত্যজ্যাকে ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। পরস্পর বিপরীত দুইটি চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা রাজা ত্রিশঙ্কুর আত্মার ন্যায়, একবার ঊর্দ্ধে উঠিয়া পরক্ষণে নিম্নে নামিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর, ত্রিশঙ্কুর আত্মা মধ্য পথে এক নক্ষত্রলোকে যেমন আশ্রয় পাইয়াছিল, মিঃ গুপ্তের হৃদয়ও সেইরূপ একটা কাল্পনিক অবলম্বনের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

তিনি সাহস পূর্ব্বক আপন মনকে শাসিত করিয়া ভাবিলেন যে, সুকুমারী এই অল্প কাল মধ্যে কখনই বিবাহিতা হইতে পারে নাই; এখন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই জানিতে পারিলে, আর কখন বিবাহের নামও করিবে না। কিন্তু এই তৃপ্তিদায়ক চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে অধিক কাল স্থায়ী হইল না; তালপত্রের অগ্নির ন্যায় একবার মাত্র প্রভা বিস্তার করিয়া পরক্ষণে নিবিয়া গেল; সন্দেহের কৃষ্ণ ধূমে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।—হৃদয় মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা, জলমধ্যে তরঙ্গ-প্রতিহত শূন্য কলসের ন্যায় আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি সভয়ে ভাবিলেন যে, সুকুমারী যদি বিবাহ করে, তাহা হইলে, পতিশোকের প্রভাব প্রবল থাকিতে থাকিতে অল্প কাল মধ্যেই তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলিবে,—হৃদয় মধ্যে স্বামীর স্মৃতি উজ্জ্বল থাকিতে থাকিতেই স্বামিশোকবিধুরা স্বামীর শেষ আদেশটা তৎপরতার সহিত প্রতিপালন করিয়া ফেলিবে। বিলম্বে শান্ত চিত্তে, তাহার ন্যায় পতিগতিপ্রাণা কখনই অন্য বিবাহ করিতে পারিবে না; তখন স্বামিশোকের প্রথম উচ্ছ্বাস যেমন প্রশমিত হইতে থাকিবে, স্বামীর অন্যায় আদেশ প্রতিপালনের আগ্রহটা তেমনই কমিয়া যাইবে। অতএব মিঃ গুপ্ত বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, সুকুমারী শীঘ্রই বিবাহ করিবে। আবার এই শোকের সময় তাহার পক্ষে মনোমত পতিলাভ করাও সহজ হইবে। এই সময় সহানুভূতি দেখাইয়া, বন্ধুজন সহজেই তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে; বিষাদবিক্ষত বক্ষ সহজেই প্রেমের শীতল প্রলেপ গ্রহণ করিবে। উদ্যান ভ্রমণে, প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্য উপভোগে, শোক সন্তপ্ত হৃদয় শান্তি লাভ করিতে পারিবে, এ জন্য বন্ধুজন তাহাকে উদ্যান ভ্রমণে লইয়া যাইবে; এবং উদ্যানের নির্জ্জনতায় সহজেই তাহার তৃষ্ণার্ত্ত কর্ণকুহরে মধুর প্রেমকথা ঢালিয়া দিতে পারিবে। হায় হায়! কেন তিনি সেই শেষ পত্রখানা লিখিলেন? সেকালের বৃদ্ধরা সত্যই বলিতেন, যে মৃত্যুকালে মানুষের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে।

ডাঃ পি, কে, বসু প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বাহিরে ছিলেন। বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া বন্ধুকে চিন্তিত দেখিয়া চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিঃ গুপ্ত অন্য কথা গোপন করিয়া কেবল মাত্র কহিলেন, "আমি ভাবছিলাম, কাল সকালে তুমি আমার শ্বশুর মহাশয়কে যে তার করলে, আজও তার উত্তর এল না কেন?"

ডাঃ বসু। আজ এতক্ষণ সেই পতিগতপ্রাণার সশরীরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কথাটা কি হচ্চে, জান? আমার টেলিগ্রামটা মোটেই বিলি হয় নি। আমি এখনই টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়েছিলাম; সেখানে জানলাম, যে ঠিকানায় তোমার শ্বশুর মশায় থাকতেন, সেখানে একজন ইংরাজ বাস করেন। তোমার শ্বশুর ও শ্বশুর কন্যা কোথায় লুক্কায়িত হয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

মিঃ গুপ্ত। এখন উপায়?

ডাঃ বসু। 'উপায় কি করি হায়, দেখে বুক ফেটে যায়, সোনার কমল যেন মাটীতে লুটায়।'

মিঃ গুপ্ত। তামাসা নয়। সত্যিই এ একটা মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

ডাঃ বসু। এ সমস্যার একটা সমাধান করতে হবে।

মিঃ গুপ্ত। আমি নিজে কলকাতায় গিয়ে তাঁদের সন্ধান নেব ;—আজই যাব।

ডাঃ বসু। শরীরে কলকাতায় যাবার উপযুক্ত বল পেতে এখনও সাত আট দিন সময় লাগবে। তার পর, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। এই সাত আট দিন মধ্যে পত্নী অন্বেষণের উপযুক্ত কতক পোষাক পরিচ্ছেদও তৈয়ারী করিয়ে নিতে পারবে।

মিঃ গুপ্ত। পোষাক তৈয়ারীর টাকা কোথায় পাব? তুমি ত জান যে আমি কপর্দ্দকহীন।

ডাঃ বসু। কিন্তু আমি পারিশ্রমিক না নিয়ে রোগী দেখিনে। তা ছাড়া, পরিবার প্রতিপালনের গুরুভার আমাকে বহন কর্ত্তে হয় না। কাযেই আমি কপর্দ্দকহীন নই; এবং তোমার মত বিপদগ্রস্থ লোককে হাজার পাঁচেক টাকা ধার দিলেও আমি কপর্দ্দকহীন হব না। সুস্থ হয়ে, নূতন পোষাক পরে, এই টাকা নিয়ে তুমি কলকাতায় যেও। আর সেখানে গিয়ে তান ধরো,—

'কাঁহা গিয়া মেরা রোশেনা জান,
দিল পিয়ারা বিনা মেরা আঁধারো মোকান।'

আর ইত্যবসরে তিনি বিদেশে লুকিয়ে মধুর কণ্ঠে গাইতে থাকুন,—

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।'

আর পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বামীর শেষ ইচ্ছা সম্পাদন করুন।

মিঃ গুপ্ত। এ সব কথার জন্যে তোমাকে সাজা পেতে হবে। তোমার দণ্ড বিধানের জন্যে আমার স্ত্রীকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো। আর টাকাটা যে তুমি আমাকে ধার দেবে, তা কি কখন ফিরে পাবার প্রত্যাশা করো? একবার ত মরেছিলাম, আবার যদি মরে যাই, তখন তোমার টাকা কে পরিশোধ করবে?

ডাঃ বসু। কেন, তোমর ত পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন বীমা আছে। সেই টাকা থেকে তোমার স্ত্রী আমার ঋণের টাকা শোধ দেবে।

মিঃ গুপ্ত। দেবে কি? যদি না দেয়?

ডাঃ বসু। বাঃ! যে স্ত্রীর এই সামান্য মহত্বে তোমার বিশ্বাস নেই, তাকে তুমি শ্রদ্ধা কর কি করে?

মিঃ গুপ্ত। না না, আমার স্ত্রী সে রকমের লোক নয়, সে নিশ্চয় দেবে। দেবার জন্যে আমি তাকে বলে যাব।

ডাঃ বসু। বলবার বোধ হয় দরকার হবে না। আমি বোধ হয় আমার বন্ধুর জন্যে এই সামান্য ব্যয়টা সহ্য করতে পারবো। ভগবান আমার রোগীদের রোগ অক্ষয় করুন;—পাঁচ হাজার টাকা আমি অল্প কাল মধ্যেই তুলে নিতে পারবো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাবু নয়নাঞ্জন ভঞ্জ।

মিঃ গুপ্ত কলিকাতায় আসিলেন। কোনও হোটেলে আপন বাসস্থান নিরূপিত করিয়া, সংবাদ সংগ্রহের জন্য বাহির হইলেন। প্রথমেই তাঁহার শ্বশুর মহাশয় যে ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বাস করিতেন সেখানে অনুসন্ধান করিলেন। জানিলেন যে, দুই সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে এক ইংরাজ বণিক ঐ বাটী ভাড়া লইয়া পরিবার সহ বাস করিতেছেন।

মিঃ অরুণোদয় দত্তের এক বন্ধু ছিলেন; তাঁহার নাম বাবু নয়নাঞ্জন ভঞ্জ; তিনি ধৃতিপরিহিত ব্রাহ্ম; এবং ব্রাহ্মসমাজের একজন আচার্য্য। মিঃ গুপ্ত হতাশ হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাইয়া শ্বশুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বাবু নয়নাঞ্জন ভঞ্জ মিঃ গুপ্তকে তিন বৎসর পূর্ব্বে বিবাহের রাত্রে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন; তথাপি মিঃ গুপ্তের মুখাবয়ব তিনি একেবারে বিস্মৃত হন নাই; মিঃ গুপ্তের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে বন্ধু-জামাতার সে মুখাবয়ব তাঁহার মানস পটে মাঝে মাঝে উদিত হইত। সেইরূপ মুখাবয়বের এক মানবকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন;—প্রেত-যোনিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, নতুবা আমরা বলিতাম যে তিনি ভূতভয়ে ভীত হইলেন।

ভীতি-সন্দেহ-বিস্ময় বিকল চক্ষে মিঃ গুপ্তকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে? কে? কে আপনি?

মিঃ গুপ্ত। আমাকে চিন্‌তে পারছেন না? আমার নাম নীরদ-বরণ গুপ্ত। আমি মিঃ অরুণোদয় দত্তের জামাতা; আমি সুকুমারীর স্বামী।

নয়নাঞ্জন বাবু। সুকুমারীর স্বামী আপনি? আপনি এখনও বেঁচে আছেন? তবে সে আপনাকে মৃত মনে করে, সুদৃশ্য কৃষ্ণ বসন ধারণ করেছে কেন? তবে জাহাজের ইংরাজ কাপ্তেন আর সেই হিন্দুস্থানী বেহারা, তারে, মুখে ও পত্রে যে সংবাদ দিল তা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা? অপনি একটু সুস্থ চিত্তে ভেবে দেখুন, আপনি ঠিক নীরদবরণ গুপ্ত কি না।

মিঃ গুপ্ত। হাঁ, আমিই নীরদবরণ গুপ্ত।

নয়নাঞ্জন বাবু। মিঃ অরুণোদয় দত্তের জামাতা নীরদবরণ গুপ্ত?

মিঃ গুপ্ত। হাঁ, আমি মিঃ অরুণোদয় দত্তের জামাতা।

নয়নাঞ্জন বাবু। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার নীরদবরণ গুপ্ত?

মিঃ গুপ্ত। হাঁ, আমি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার।

নয়নাঞ্জন বাবু। এখনও আপনার কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি নে। বঙ্গোপসাগরে আপনি সমাহিত হয়ে-

ছিলেন। জিওগ্রাফিতে পড়েছি, বঙ্গোপসাগর প্রায় তিন মাইল গভীর। সেই গভীর সমুদ্র হতে, হাঙ্গর কুমীরের মুখ থেকে অসাড় মৃতদেহটাকে রক্ষা করে' আপনি কেমন করে বেঁচে উঠলেন? এমন অসম্ভব কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

মিঃ গুপ্ত। আমার কথা আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে বলছি নে, কেবল আমি আপনার নিকট জান্‌তে চাই, মিঃ দত্ত এখন সপরিবারে কোথায় আছেন?

নয়নাঞ্জন বাবু। সে কথা যদি আমি জানতাম, আপনাকে তা বলতে বোধ হয় আমার আপত্তি থাকতো; কিন্তু তাঁরা কোথায় আছেন, আমি তা জানি না।

নয়নাঞ্জন বাবুর নিকট বিফল মনোরথ হইয়া মিঃ গুপ্ত হোটেলে আপন কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। তিনি অন্য কোনও বন্ধুর নিকট প্রকাশিত হইতে সাহস করিলেন না। হয়ত নয়নাঞ্জন বাবুর মত তাহারাও তাঁহার সজীব অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। তিনি এক সপ্তাহ কলিকাতায় থাকিয়া আত্মগোপন করিয়া, বন্ধুদের বাটীর নিকটে যাইয়া ভৃত্যশ্রেণীর অপরিচিতদের নিকট সংবাদ লইতে লাগিলেন।

মিঃ গুপ্তকে বিদায় দিয়া, নয়নাঞ্জন বাবু আপনার চক্ষু হইতে চশমাখানি খুলিয়া, বসন প্রান্তে তাহা মার্জ্জিত করিয়া আপনার বাম পার্শ্বে রাখিলেন; পরে শয্যার উপর নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন, এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বক্ষের উপর দুইহস্ত

স্থাপিত করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"হে অলৌকিক, হে অজ্ঞেয়, এ বিশ্বলোকে তোমার একি লীলা? হিন্দুস্থানী বেহারা সামান্য পৌত্তলিক সে মিথ্যা কথা বলিতে পারে; কিন্তু তারের সংবাদ—সংবাদপত্রের সংবাদ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব আমার বন্ধুর জামাতা নীরদবরণ নিশ্চয় মরিয়াছে; এবং হে অগতির গতি! পৃথীবির পুঞ্জীকৃত পাপ ক্ষমা করিয়া, তুমি নিশ্চয় তাহার সদ্গতি করিয়াছ। তাহার আত্মার সদ্গতির জন্য আমারা ব্রাহ্মসভায় বসিয়া তোমার চরণে যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা, হে নিরাকার, নিশ্চয় তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছ। তবে আবার সেই নীরদবরণের পার্থিব মূর্ত্তি দেখিলাম কেন? হে ভূতভাবন! তুমি কি আমার এই ব্রহ্মনিষ্ঠ মনে ভূতের ভয় প্রবেশ করাইতে চাও? হে সত্যমেবাদ্বিতীয়ং, আমি সত্য বলিতেছি, আমি ভূতের ভয় করিনা। তথাপি আমার মনে যদি সেই ভয়ের উদয় হইয়া থাকে, হে সর্ব্বশক্তিমান, তুমি তাহা নিবারণ করিও। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

এই ভগবৎ প্রার্থনার পর, বাবু নয়নাঞ্জন ভঞ্জের মন হইতে দারুণ ভূত ভীতি বিদূরিত হইয়াছিল কি না আমরা তাহার সংবাদ রাখি না। কিন্তু ইহা সত্য যে, তিনি অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটও কখন নীরদবরণ গুপ্তের প্রেতমূর্ত্তি দর্শনের কথা বিবৃত করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, লোকের কাছে সে কথা প্রকাশ করিলে লোকে তাঁহাকে ভূত প্রেত বিশ্বাসী পৌত্তলিক

মনে করিবে ; ইহাতে তাঁহার পরম-ব্রহ্ম-নিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

এইরূপে মিঃ গুপ্তের আত্মগোপন চেষ্টায় এবং বাবু নয়নাঞ্জন ভঞ্জের ব্রহ্মনিষ্ঠায় কলিকাতার লোক জানিতে পারিল না যে, মিঃ গুপ্ত তখনও সশরীরে জীবিত আছেন। কলিকাতার লোক এ সংবাদ জানিতে পারিলে, মিঃ অরুণোদয় দত্ত ও সুকুমারী নিশ্চয় তাহা শুনিতে পাইতেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মিঃ রুদ্রকান্ত বানার্জ্জি।

কলিকাতায় কয়েক দিন অনুসন্ধানের ফলে মিঃ গুপ্ত জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় এবং তৎকন্যা দেওঘরে গিয়াছেন; এবং সেখানে তাঁহারা মিঃ রুদ্রকান্ত বানার্জ্জির বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের বাসের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য মিঃ রুদ্রকান্ত বানার্জ্জি স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছেন।

মিঃ রুদ্রকান্ত বানার্জ্জির নাম শুনিয়া মিঃ গুপ্ত ললাট কুঞ্চিত করিলেন। সে নামে চিন্তিত হইবার বিলক্ষণ কারণ ছিল। মিঃ রুদ্রকান্ত সুপুরুষ এবং মহা অর্থবান এবং অবিবাহিত; তাহার উপর, তিনি পূর্ব্বে একবার অবিবাহিতা সুকুমারীর পাণিগ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপনও করিয়াছিলেন; এবং সেই প্রস্তাব উত্থাপনের পরেই তিনি যদি পীড়িত হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য দীর্ঘ কাল বিদেশে বাস না করিতেন, তাহা হইলে, হয় ত সুকুমারী তাঁহাকেই বিবাহ করিত। সেই রুদ্রকান্ত সুকুমারীর স্বামিশোকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন;—পতিবিরহিণীর তপ্ত বিরহ ব্যথার উপর শীতল প্রেমকথার প্রলেপ দিতেছেন! এতদিনে রুদ্রকান্ত হয় ত রুদ্রত্ব হারাইয়া কান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; এবং হসন্ত আননে গুপ্তের মস্তকটি প্রকাশ্যে চর্ব্বণ করিতেছেন।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া, মিঃ গুপ্ত সেই দিনই দেওঘর অভিমুখে ছুটলেন ; এঞ্জিনকে বেত্রাঘাত করিলে যদি গাড়ী আরও বেগে চলিত, তাহা হইলে, আমাদের মনে হয়, মিঃ গুপ্ত ক্লান্তি অনুভব না করিয়া কষাঘাতে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু এই কার্য্যের অভাবে, তিনি যানাভ্যন্তরে বসিয়া অধীর ভাবে, যানের দারুময় কুট্টিমে, আপনার হস্তস্থিত যষ্টি প্রান্ত দ্বারা মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সে আঘাতে গাড়ীর গতিবেগ এতটুকু বৰ্দ্ধিত হইল না।

জসিদি জংসন হইতে দেওঘর প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে। জসিদি জংসনে নামিয়া অন্য গাড়ীতে চড়িয়া দেওঘর যাইতে হয়। মিঃ গুপ্ত জসিদি জংসনে নামিয়া জানিলেন যে, দেওঘরের গাড়ী পাইতে হইলে, প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। তখন রুদ্রকান্তের রুদ্র মূৰ্ত্তি হুতাশসনের ন্যায় তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর জ্বলিতেছিল ; তিনি কিরূপে এই তিন ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিবেন। সেটা নিশাবসান কাল ; ষ্টেশনে তখন যান বাহন কিছুই ছিল না। সুতরাং তিনি পদব্রজে দেওঘর অভিমুখে ছুটিলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া তিনি সহজেই মিঃ রুদ্রকান্ত বানার্জ্জির বাঙলো খুঁজিয়া লইতে পারিলেন। পরিচ্ছন্ন, গোলাপ-নিকুঞ্জ পরিবেষ্টিত 'কুঞ্জকুটীর' নামক বৃহৎ শ্বেত ভবন লোকে সহজেই দেখাইয়া দিতে পারিল।

মিঃ গুপ্ত বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সে

বাটীতে কেহ বাস করিতেছে না। দেখিলেন, যে বাগানের ফটকে তালা ঝুলিতেছে; বাটীর দ্বার ও গবাক্ষ সমস্তই বন্ধ রহিয়াছে।

নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র বাটীতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিতেন। মিঃ গুপ্ত তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোকটি কহিলেন,—"হাঁ, রুদ্রকান্ত বাবু তাঁর ভাবী পত্নী ও ভাবী শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে নিয়ে এসে, দিন কতক খুব আমোদে ঐ বাড়ীতে বাস করে গেছেন।"

মিঃ গুপ্তের হৃৎপিণ্ডটা কে যেন মুদ্গরাঘাতে নিষ্পেষিত করিয়া দিল। তাহার বক্ষের উপর কে যেন কণ্টকময় কষাঘাত করিল। এই স্ত্রী! এই স্ত্রীরই সামান্য দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা মরণের পথে ছুটিয়া যাই! এই স্ত্রীই তাঁহাকে একদিন প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিল, 'জন্ম জন্ম তুমি আমার অনন্তপতি হয়ে থাকবে।' আবার দুই দিন পরে রুদ্রকান্তকেও ঠিক সেই কথাই বলিবে! হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষত অতি কষ্টে লুক্কাইত করিয়া মিঃ গুপ্ত সেই ভদ্রলোকটিকে আবার প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি করে জানলেন যে তাঁরা রুদ্রকান্ত বাবুর ভাবী স্ত্রী আর শ্বশুর শ্বাশুড়ী।"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "জাত যাবার ভয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে মেশামিশি করিনি বটে, কিন্তু আমাদের চোখ ত আছে। চক্ষুষ্মানকে কি কোন কথা বলে দিতে হয়? হাত ধরাধরি করে নির্জ্জন রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, চুপি চুপি কথা কওয়া, গাছে ফুল

কুট্‌লে তুলে হাতে দেওয়া—এই সবকেই ত আপনারা কোর্টসিপ করা বলেন।”

মিঃ গুপ্ত মনে মনে ভাবিলেন, “উহাকেই আমরা বধআজ্ঞা বা বজ্রাঘাত বলি।” প্রকাশ্যে কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাঁরা এখান থেকে কবে চলে গেছেন?”

ভদ্র। কাল বিকালের গাড়ীতে গিয়েছেন।

মিঃ গুপ্ত। কোথায় গেছেন?

ভদ্র। তা বলতে পারিনে, মশাই। তাঁদের সব বড়মানুষী ও সাহেবী চাল; তাঁরা আমাদের মত গরীব বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথাই কইতেন না।

মিঃ গুপ্ত মনে মনে ভাবিলেন, ষ্টেশনে যাইয়া অনুসন্ধান করিলে তাঁহারা কোথার টিকিট কিনিয়াছেন, তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যাইবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর যাত্রী; এবং বিলাতি পরিচ্ছদধারী বাঙ্গালী। টিকিট বাবু যদি বাঙ্গালী হ’ন, তাহা হইলে তিনি এত শীঘ্র কথনই তাঁহাদের ভুলিয়া যান নাই। ইহা মনে করিয়া তিনি ষ্টেশনে আসিয়া সন্ধান লইলেন যে তাঁহারা গয়ার টিকিট কিনিয়া গয়ায় গিয়াছেন। বাঙ্গালী টিকিট বাবু আরও বলিলেন,—“কিন্তু ঐ যুবতীটির স্বামী তাঁদের সঙ্গে যান নি। তিনি তাঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে, ওয়েটিং রুমে থানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে, হাওড়ার টিকিট কিনে ডাউন ট্রেণে কল্‌কাতায় গেছেন।”

মিঃ গুপ্ত ব্যাকুল হৃদয়ে ভাবিলেন যে সেই ভদ্র ব্যক্তি উভয়কে

ভাবী স্বামী স্ত্রী মনে করিয়াছিলেন ; এখানে টিকিট বাবু বলিতেছেন যে তাহারা একবারে পাকা স্বামী স্ত্রী। কে জানে হয়ত ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমেই মালাবদল হইয়া গিয়াছে। কিংবা টিকিট বাবু উভয়ের মধ্যে এমন কোন প্রেমলীলা দেখিয়াছেন, যাহাতে তিনি উভয়কে স্বামী স্ত্রী মনে করিয়াছেন। মিঃ গুপ্ত মনে কতকটা বল সঞ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন ক'রে জানলেন যে তাঁরা স্বামী স্ত্রী ?'

টিকিট বাবু কহিলেন, "স্বামী ছাড়া আর কি হ'তে পারেন ? উপপতিকে নিয়ে কেহ ত বাপ মার সঙ্গে একত্রে আসে না। আর একটা প্রণয়ের টান না থাকলে, বিদায় দেবার সময় কেউ ত কাঁদে না।" আমি এই জানালা থেকে দেখলাম, যে যুবতীটি গাড়ীতে বসে কেবল কাঁদছেন ; তাঁর দু গাল বয়ে কেবল চোখের জল পড়ছে ; আর তাঁর স্বামী গাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে কেবল তাঁকে সান্ত্বনা করছেন।"

রুদ্রকান্তাতঙ্কে মিঃ গুপ্তের মস্তিস্ক বিকৃত হইয়াছিল। সুকুমারী যে তাঁহাকেই মৃত মনে করিয়া গাড়ীতে তাঁহারই শোকে অশ্রুপাত করিয়াছিল, এ কথা তাহার বিকৃত মস্তিষ্কে স্থান পাইল না। তিনি ভাবিলেন, "উঃ! এই ক'দিনেই এত প্রেম! এত টান! এত কান্না! আচ্ছা, রুদ্রকান্ত কলকাতায় গেল কেন ? আমার মনে হয়, বিয়েটা এখনও হয় নি। বোধ হয় বিয়ের উদ্যোগ করবার জন্যেই রুদ্রকান্ত আগে কলকাতায় গেছে। দু'চার দিনের জন্যে বিচ্ছেদ, এই বিচ্ছেদ ব্যথাতেই এত কান্না! মায়াবিনীরা সব পারে!

আচ্ছা বিয়ের আগে সুকুমারী গয়ায় গেল কেন? তারা যদি গোঁড়া ব্রাহ্ম না হ'ত, আমি ভাবতাম গয়ায় আমার পিণ্ডি দিতে গেছে; একবারে পিণ্ডি দিয়ে কলকাতায় এসে বিয়ে করবে। পিণ্ডি দেবার বেলা হিন্দু মত, আর বিয়ে করবার বেলা ব্রাহ্ম মত! কিন্তু এ বিয়ে আমি হ'তে দেব না। গয়ায় গিয়ে তাদের ধরব, আর বিয়ের নেশা ভেঙ্গে দেব।"

গয়ার ডাকবাঙ্গলায় এক পক্ষকাল অবস্থিতি করিয়া মিঃ গুপ্ত পত্নীর কোন সন্ধানই পাইলেন না। পাণ্ডারা একবাক্যে বলিল যে, তাহারা হিন্দু ছাড়া অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী যাত্রীর কোনও সংবাদ রাখে না। অবশেষে মিঃ গুপ্ত ভাবিলেন যে, এতদিন গয়ায় থাকা তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই। এতদিনে তাঁহারা নিশ্চয়ই কলিকাতায় ফিরিয়াছেন; এবং মিঃ রুদ্রকান্ত ব্যানার্জির সহিত সুকুমারীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু—যদি বিবাহ সত্যই হইয়া থাকে, তিনি স্রোতের মত তাহাদের পাছু পাছু ফিরিয়া উৎসবালোক অন্ধকার করিয়া দিবেন; বিষধর ফণীর মত পায়ে পায়ে ফিরিয়া তাহাদের সোহাগমধুতে তীব্র বিষ ঢালিয়া দিবেন। অতএব মিঃ গুপ্ত উন্মত্তবৎ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি অত্যন্ত গোপনে ব্রাহ্মসমাজে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, মিঃ রুদ্রকান্তের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই; এবং তাঁহার বিবাহের এ পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাবই উত্থাপিত হয় নাই। পরন্তু মিঃ অরুণোদয় দত্তও কন্যাসহ

কলিকাতায় প্রত্যাগত হন নাই; কন্যার শোকসন্তপ্ত মনে শান্তি দিবার জন্য, তাহারা পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থস্থানগুলি দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু এক্ষণে ঠিক কোথায় আছেন, সে সংবাদ পাওয়া গেল না।

তা না যাক্। মিঃ গুপ্ত অনায়াসে তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। পত্নীর বিবাহ হয় নাই জানিতে পারিয়া, অপিচ তাহার শোকসন্তপ্ত মনে এখনও শান্তি আসে নাই বুঝিয়া, মিঃ গুপ্ত পরম শান্তিলাভ করিলেন। তিনি প্রফুল্ল মনে মহা উৎসাহে পত্নীর পশ্চাতে ছুটিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পত্নীর পশ্চাতে।

পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল তীর্থস্থান আছে, এবং ঐ সকল স্থানে যে উপায়ে যাইতে হয়, মিঃ গুপ্ত তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তাহার পর পত্নীর অন্বেষণে তীর্থ পরিভ্রমণে বাহির হইলেন।

প্রয়াগ তীর্থে নিশ্চয়ই ভার্য্যার সন্ধান পাইবেন মনে করিয়া, তিনি সর্ব্বপ্রথমেই এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। সেখানে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ইংরাজি হোটেলে কয়েক দিনের জন্য বাস করিয়া, তিনি সেই বিস্তৃত নগরের পুরাতন ও নূতন অংশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। গঙ্গার বালুকাময় চরভূমিতে, যমুনার শস্পমণ্ডিত সৈকতে, বাদশাহ আকবরের নির্ম্মিত পুরাতন কেল্লাতে, কেল্লামধ্যস্থিত অক্ষয় বটের গুহায়, খস্রুবাগের সমাধি ছায়ায়, মেও হলের উচ্চ চূড়ায়, মনোহর স্মৃতি-উদ্যানে, কোলাহলময় রেল-ষ্টেশনে—কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না; বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরাজ কাহারও মুখে মিঃ অরুণোদয় দত্তের কথা শুনিতে পাইলেন না। ডাকঘরে, টেলিগ্রাফ আফিসে, স্থানীয় সংবাদপত্রে কোথাও তাঁহাদের উল্লেখ দেখিলেন না; হোটেলে, দোকানে, পথে ঘাটে কোথাও তাহাদের ছায়াপাতের সন্ধান পাইলেন না।

অবশেষে মিঃ গুপ্ত মনে করিলেন যে, তাঁহারা হয়ত এখনও এলাহাবাদে আসেন নাই। তাঁহারা বোধ হয় গয়া হইতে বারাণসী যাইয়া এখনও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দু-বিধবাদিগের ন্যায় সুকুমারী বোধ হয় হিন্দুর সেই পুরাতন তীর্থে বেশী দিন বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। আহা! আপনাকে বিধবা জানিয়া, সে বোধ হয় হিন্দু-বিধবাদের মত শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে যায়। আহা! বৈধব্য-দশায় হিন্দু হওয়াই ভাল! আহা! কবি যথার্থই গাহিয়াছেন,—

"অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবাসম কোথা পাব ললনা।"

মিঃ গুপ্ত আর কালবিলম্ব না করিয়া এলাহাবাদ হইতে বারাণসীতে আসিলেন। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহারা সত্যই বারাণসীতে ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা বারাণসী ত্যাগ করিয়াছেন; সম্ভবতঃ মির্জ্জাপুর হইতে বিন্ধ্যাচলে গিয়াছেন। শুনিয়া মিঃ গুপ্ত বিন্ধ্যাচলে আসিলেন; কিন্তু সেখানে তাঁহাদিগের কোনও সন্ধান পাইলেন না।

অতঃপর মিঃ গুপ্ত স্থির করিলেন যে, একে একে সকল তীর্থস্থানেই তিনি তাঁহার শোক-সন্তপ্তা সুকুমারীকে খুঁজিয়া বেড়াইবেন। প্রায় তিন মাস ধরিয়া তিনি তাহাই করিলেন।

কোনও কোনও তীর্থস্থানে তিনি তাহার সংবাদ পাইলেন বটে, কিন্তু কোনও স্থানে প্রাণাধিকার সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি হরিদ্বারে যাইয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা হরিদ্বার হইতে হাওড়ার টিকিট কিনিয়া সাত দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

তখন তিনি আবার কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া শ্বশুর-কুলের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাগত হন নাই। বুঝিলেন যে, তাঁহারা হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া, কলিকাতায় অবস্থিতি না করিয়া, ছুটীর অবশিষ্ট পাঁচ মাস অতিবাহিত করিবার জন্য আবার তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। হয় ত দক্ষিণাপথের তীর্থগুলি দেখিবার জন্য তাঁহারা হাওড়া হইতেই উড়িষ্যা এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে গিয়াছেন।

মিঃ গুপ্ত পত্নীর অন্বেষণে দুই তিন মাস ধরিয়া দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু কোথাও সুখময়ী সুকুমারীর কমল মুখ দেখিতে পাইলেন না। পুরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া, কোনও স্থানে তাহাদের কোনও সংবাদই পাইলেন না। তাহারা কোথায় গেল? এটা যদি পুরাকাল হইত, তাহা হইলে মিঃ গুপ্ত ভাবিতেন যে, তাঁহার কমলমুখী কালিয়-দহের কমলদলমধ্যে লুকাইয়া গজরাজ কর্তৃক সেবিতা হইতেছে; অথবা কোন রাবণকুলতন্তু কর্তৃক অপহৃতা হইয়া, সমুদ্রপারে লঙ্কার অশোকোদ্যান মধ্যে বসিয়া সতী সীতার ন্যায় স্বামিবিরহে অশ্রুজলে ভাসিতেছে।

হৃদয়ে চিন্তাভার বহন করিয়া মিঃ গুপ্ত আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা আসিবার পথে ওয়াল্‌টেয়ার ষ্টেশনে আসিয়া তিনি একবার মনে করিয়াছিলেন যে, সেখানে যাত্রাভঙ্গ করিয়া, তিনি একবার তাঁহার বন্ধু ও জীবন-দাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লইবেন; এবং পত্নীর অন্বেষণ জন্য কি করা আবশ্যক, তদ্‌বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার মাথায় তখন একটা মতলবের উদয় হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সত্বর কলিকাতায় ফিরিয়া, জীবন-বীমার আফিসে অনুসন্ধান করিলে, সহজেই সুকুমারীর সন্ধান পাওয়া যাইবে;—সে নিশ্চয় এতদিন জীবন-বীমার আফিস হইতে প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠাইয়া লইয়াছে, এবং কোন্ ঠিকানায় তাহাকে টাকা পাঠাইয়াছে, তাহা ঐ আফিসে নিশ্চয় জানিতে পারা যাইবে। এই মতলব মাথায় লইয়া তিনি ওয়াল্‌টয়োরে নামিয়া কালবিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

সেদিন যদি তিনি ওয়াল্‌টেয়ারে নামিতেন, তাহা হইলে আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা বিফল হইয়া যাইত। হয়ত তিনি ষ্টেশনের নিকটেই পত্নীর, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর সাক্ষাৎ পাইতেন। কারণ দারজিলিং হইতে নামিয়া তাঁহারা সেই দিনই, প্রায় বার মিনিট পূর্ব্বে দক্ষিণমুখী অন্য গাড়ীতে ওয়াল্‌-টেয়ারে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিধবার বিবাহ সম্ভাবনা থাকিত না; আমাদের কাহিনী এই-

খানেই শেষ হইয়া যাইত। তোমরা, পাঠকবর্গ, তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতায় আসিয়া মিঃ গুপ্ত জীবন-বীমা আফিসে অনুসন্ধান করিলেন। জানিলেন যে, সুকুমারী জীবন-বীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠাইয়া লইয়াছে; সাত দিন পূর্ব্বে দারজিলিংএ তাহার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দারজিলিংএ যে ঠিকানায় চেক পাঠান হইয়াছে, প্রশ্নের দ্বারা মিঃ গুপ্ত তাহাও জানিয়া লইলেন।

সুকুমারীর এই অর্থপ্রাপ্তি ও দারজিলিংএ অবস্থিতি, এই দুইটার একটাও মিঃ গুপ্তের মনে শান্তি দিতে পারিল না। তিনি জানিতেন, যে অর্থাধিকারিণীগণের স্বামিভাগ্য সদাই প্রসন্ন থাকে; আর যুবক-যুবতীগণের হৃদয়-নিহিত প্রেমাঙ্কুর দারজিলিংএর শৈত্যে সহজেই পত্রপুষ্পে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

সেই দিনই চিন্তিত মনে, দিবাবসান কালে শেয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া তিনি দারজিলিং মেলে আরোহণ করিলেন; এবং পরদিন দ্বিপ্রহরে দারজিলিংএ নামিলেন।

সেখানে পোষ্ট আফিসের পিয়নদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মিঃ অরুণোদয় দত্ত যে বাটীতে বাস করেন, তাহা সহরের কোন দিকে এবং কোন রাস্তার নিকটে অবস্থিত। পরে সেই বাটীতে যাইয়া, তিনি বাটীর চৌকীদারের মুখে জানিতে পারিলেন যে, মিঃ দত্ত কন্যা ও পত্নীকে লইয়া দুই দিন পূর্ব্বে দারজিলিং ত্যাগ করিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়া

মিঃ গুপ্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিলেন, 'অর্থাৎ জীবন-বীনার পঞ্চাশ হাজার টাকা হস্তগত করিয়াই উধাও হইয়াছেন।'

কয়েক দিন দারজিলিংএ অবস্থিতি করিয়া মিঃ গুপ্ত শরীরের ও মনের অবসাদ কতকটা বিদূরিত করিলেন। তাহার পর পত্নীর অন্বেষণে আবার কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ত কলিকাতাতে ছিলেন না। সুতরাং মিঃ গুপ্ত কলিকাতাতে তাঁহাদের কোনও সন্ধানই পাইলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কুকুরের কাণ্ড।

সাগরতীরে নির্জ্জন পথ। এই পথ ওয়াল্‌টেয়ার হইতে বিজাগাপত্তমের পুরাতন সহর পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই রাস্তার কথা, আমরা এই কাহিনীতে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। রাস্তাটা এত ভাল যে, ইহার একাধিকবার উল্লেখ জন্য আমাদের অপরাধ, আমরা জানি, তোমরা ক্ষমা করিবে। এই রাস্তার একদিকে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বারিনিধির অসীম গৌরব, অন্যদিকে ক্ষুদ্র গুল্মাচ্ছাদিত টিলাগুলির শ্যামল প্রফুল্লতা, এবং বিচিত্র আকাশ-গাত্রে বা অনুচ্চ পর্ব্বতপার্শ্বে তালবৃক্ষশ্রেণীর চিত্তহর চিত্র—একদিন দিবাবসানকালকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মধুর দৃশ্য যেন মানব-মনকে বুঝাইয়া দিতেছিল যে, আমাদের এই সসাগরা ধরা আনন্দময়েরই রাজ্য।

সেইদিন সেই পথে বিচরণ করিতে করিতে সুকুমারী ভক্তি-পূর্ণ চিত্তে সেই মধুরতা উপভোগ করিতেছিল। অনতিদূরে তাহার পিতার বৃদ্ধ বেয়ারা তাঁহার ওভারকোটটি স্কন্ধে বহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

ছয় মাস পূর্ব্বে যে শোকের তীক্ষ্ণ আঘাতে সুকুমারীর দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছিল, এখন তাহার দেহে সে শোকের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান ছিল না। সুকুমারী এখন দেহে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও মনে

পূর্ণ প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইয়াছিল। এখন স্বামী আর শোকের সামগ্রী ছিলেন না। তাঁহার পুণ্য স্মৃতি এখন সুকুমারীর নিকট আরাধনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন স্বামীর কথা স্মরণ করিলে, বা আলোচনা করিলে, সুকুমারীর মনে শোক বা বিরহ জাগিয়া উঠিত না। বরং স্বামীর মধুর মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া, এবং মনে মনে সে মূর্ত্তির পূজা করিয়া সে হৃদয়মধ্যে একটা আনন্দ উপভোগ করিত। বিষাদের ধূপধুনার মধ্যে আরতির আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সুকুমারী সহসা পশ্চাদ্দিকে কুক্কুরের ডাক ও বৃদ্ধ বেয়ারার চিৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইল। এই চিৎকারে বিচলিত হইয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে, একটা ভীষণাকার বিজাতীয় সারমেয় রক্ষকের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বেয়ারা বেচারাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে; রক্ষক কোনওক্রমে তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। বেয়ারা চিৎকার করিতে করিতে সুকুমারীর ওভার-কোটের দ্বারা দেহ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া মহা ভয়ে ভীত হইয়া সুকুমারীও চিৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু বেয়ারাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

কুকুরের দংশনে নিশ্চয়ই সেদিন সেই পুরাতন ভৃত্যের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইত। কিন্তু ভগবান তাহাকে রক্ষা করিলেন। ঠিক সেই সময় সেই পথ দিয়া একখানা মোটর গাড়ী ধাবিত হইতে-

ছিল। এক ইংরাজি পরিচ্ছদধারী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঐ মোটর চালাইতেছিলেন; গাড়ীতে তিনিই একমাত্র আরোহী। তিনি সুকুমারীর চিৎকার শুনিয়া ও বেয়ারার বিপদ দেখিয়া শকট-গতি স্থগিত করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বেত্রহস্তে গাড়ী হইতে নামিয়া কুকুরের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহাকে বেত্রহস্ত দেখিয়া, এবং ইত্যবসরে বেয়ারাকে পথপার্শ্ব হইতে প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান কুক্কুরীনন্দন লাঙ্গুল সংগোপন করিয়া সহজেই আপন রক্ষকের বন্ধনে ধরা দিল।

তখন মোটর-অধিকারী ভদ্র ব্যক্তি সুকুমারীর নিকট আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "কুকুরটা ভারি দুষ্টু। আপনি বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছিলেন ?"

সুকুমারী ভদ্র ব্যক্তিকে প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিল, "একটু নয়, আমরা ভয়ানক ভয় পেয়েছিলাম। আপনি হঠাৎ এসে না পড়লে হয় ত বেয়ারা বেচারা কুকুরের কামড়ে মারা যেত। আমরা আপনার সাহায্যে কতটা কৃতজ্ঞ হ'য়েছি, তা মুখে বলবার নয়।"

ভদ্রব্যক্তি। এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছুই নেই। এখন আমি একটা প্রস্তাব করব। আমি ওয়াল্‌টেয়ারের দিকে যাচ্ছি। আপনাদের বাড়ী যদি ওয়াল্‌টেয়ারের দিকে হয়, আর আমার ধূলিপূর্ণ গাড়ীতে বস্‌তে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি আহ্লাদের সহিত আপনাদিগকে বাড়ী পৌঁছে দেব।"

সুকুমারী বুঝিল যে উপকারী ভদ্রের দ্বিতীয় উপকারের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা ভদ্রজনোচিত বা সুবিধাজনক হইবে না। অতএব সে কহিল, "এতে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না ত?"

ভদ্রব্যক্তি। কিছু না। বরং আমার একটু উপকার হবে;—আমার গাড়ীর ধূলা আপনার নির্ম্মল ও সুগন্ধি বস্ত্রের দ্বারা পরিস্কৃত হবে। আমার গাড়ী পরিষ্কারের যখন আবশ্যক হয়, তখন আমি মাঝে মাঝে এই কৌশলই অবলম্বন করি।

সুকুমারী হাসিল।

ভদ্র ব্যক্তি গাড়ীর দ্বার খুলিয়া কহিলেন, "আপনারা ওয়াল-টেয়ারে কোন্ বাড়ীতে নামবেন? আমি এখানকার পুরাতন লোক; আমি এখানকার সকল বাঙ্গালীকেই জানি। কিন্তু আপনাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না; আপনারা কোন্ বাড়ীতে বাস করেন—তা ত জানিনে।

সুকুমারী। সম্প্রতি আমরা বসন্ত-কুটীর নামক বাঙ্গালাটি ভাড়া নিয়েছি। সেখানে আমি আমার বাপমার সঙ্গে সাত-আট দিন মাত্র বাস করছি। বাবা বুড়ো মানুষ, এখনও এখান-কার সকল বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ ক'রে উঠতে পারেন নি। তিনি কালই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবেন; আর আপনাকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবেন।

ভদ্রব্যক্তি। কিন্তু একটা কুকুর তাড়ানর জন্যে আরও কৃতজ্ঞতা জানালে আমি আরও কাবু হ'য়ে পড়বো। তার চেয়ে,

আপনি অনুমতি করলে, আমি বরং একদিন এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে যাব। আপনার কাছে তাঁর নামটি জানতে পারলে ভারি খুসী হব।

সুকুমারী। তাঁর নাম মিঃ অরুণোদয় দত্ত বা প্রফেসার দত্ত।

ভদ্রব্যক্তি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সুকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সুকুমারী যদি ঠিক সেই সময় গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে সে মোটরস্বামীর সেই বিস্ময় দৃষ্টি দেখিয়া, নিশ্চিত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িত। হয়ত সেই বিস্ময়ের কারণ না জানিয়া সে মোটেই গাড়ীতে আরোহণ করিত না।

এই মোটর-অধিকারী ভদ্র ব্যক্তি কে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। তিনি মিঃ গুপ্তের জীবনদাতা বন্ধু মিঃ পি, কে, বসু ব্যতীত আর কেহ নহেন। তাই প্রফেসর দত্তের নাম শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ডাঃ বসুর দুষ্টবুদ্ধি ।

সুকুমারী ডাঃ পি, কে, বসুর মোটর গাড়ীর ভিতর উপবেশন করিল ; বৃদ্ধ বেয়ারাও গাড়ীর ভিতর সম্মুখের আসনে বসিল। গাড়ীর বাহিরের আসনে বসিয়া ডাঃ বসু শকটচালনা করিলেন। সমুদ্রবায়ু তাঁহাদের ললাট স্পর্শ করিল। তিনি স্থির চিত্তে ভাবিলেন, এই অরুণোদয় দত্তই তাঁহার বন্ধুর শ্বশুর, আর হয়ত এই যুবতীই তাঁহার বন্ধুপত্নী। কৈ, ডাঃ পি, কে, বসু তাহাকে ত স্বামিশোকে শীর্ণা দেখিলেন না। তিনি স্থির করিলেন যে, এই ভদ্রার আর একটু পরিচয় গ্রহণ না করিয়া, তিনি বন্ধুর জীবনরক্ষা সংবাদ ইহাকে প্রদান করিবেন না।

অল্পকাল মধ্যে গাড়ী বসন্তকুটীরের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই অবসরে মোটর গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহাদের দ্বারে কে আসিল, তাহা দেখিবার জন্য মিঃ অরুণোদয় দত্ত বারান্দায় বাহির হইয়াছিলেন, সুকুমারী ডাঃ পি, কে, বসুকে পিতার নিকট লইয়া গিয়া সারমেয় ঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা বিবৃত করিল। মিঃ অরুণোদয় দত্ত অত্যন্ত সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া ডাঃ পি, কে, বসুকে আপন পাঠাগারে লইয়া গেলেন। সেখানে সুকুমারী ও সুকুমারীর পিতার সমুদয় পরিচয় পাইয়া ডাঃ বসু ভাবিলেন যে, যাঁহাদের সন্ধানের জন্য শোণিতঘ্রাণোন্মত্ত কুকুরের ন্যায় মিঃ গুপ্ত

দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, অবশেষে তাঁহারা তাঁহারই গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে মিঃ গুপ্তকে ওয়াল-টেয়ারে আনাইয়া পতিপত্নীর মিলন করিয়া দিবেন।

কিন্তু তিনি সহসা মিঃ গুপ্তের সংবাদ সুকুমারীকে প্রদান করা সুবিধাজনক মনে করিলেন না। ভাবিলেন, তাড়াতাড়ি কি? অন্য একদিন ধীরে ধীরে সকল কথা শুনাইবেন। ততদিন সুকুমারীকে ও তাহার পিতামাতাকে তাহার জীবিত থাকার সংবাদ প্রদান করা সঙ্গত হইবে না। হয়ত তাঁহার কথায় সুকুমারী ও তাহার পিতামাতা সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। অতএব তিনি সুকুমারীকে স্বামিসংবাদ প্রদান করিলেন না।

সুকুমারীর শুভসংবাদটা ত্বরায় তারযোগে মিঃ গুপ্তকে জানাইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু ডাঃ বসু তাহাও করিতে পারিলেন না। তিনি অনেক দিন মিঃ গুপ্তের কোন পত্রই পান নাই; এবং তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা কি তাহাও জানিতেন না। অতএব তৎকালে শ্বশুরকুলের কোনও সংবাদ মিঃ গুপ্ত প্রাপ্ত হইলেন না।

মিঃ অরুণোদয় দত্ত মনে করিয়াছিলেন, কন্যা সুকুমারী অবশ্যই এই নব পরিচিতের সকল পরিচয় গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং তিনি ডাঃ বসুর কোন তথ্য সংগ্রহ করিবার ব্যগ্রতা দেখাইলেন না। ডাঃ বসুও ভাবিলেন যে, আপাততঃ নিজের পরিচয় গোপন রাখিতে পারিলেই ভাল হয়—তাঁহার নামটা স্বামীর নিকট হয়ত

সুকুমারী শুনিয়াছে; এবং মনে করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে মৃত স্বামীর বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিলে, হয়ত সে সরল ভাবে তাঁহার সহিত মিশিবে না; সরলভাবে তাঁহাকে আপন অন্তরের গুপ্ততত্ত্ব জানিতে দিবে না; অন্তরমধ্যে সে এখন বিধবা-বিবাহের আশা পোষণ করে কিনা, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। অতএব তিদি আপনার পরিচয় প্রদান না করিয়াই, মিঃ অরুণোদয় দত্তের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন; এবং আপন মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু স্ত্রীজাতি কথনও নবপরিচিতের সকল পরিচয় গ্রহণ না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না; এবং আমার পাঠকবর্গকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, সুকুমারীও স্ত্রীজাতি। অতএব ডাঃ বসু মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সে তাহার গতিরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার উপকারীর নামটি কি, তা কি আমরা জানতে পারি?"

ডাঃ বসু দেখিলেন যে, 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।' পিতাকে পরিচয় না দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কন্যার হাতে রক্ষা নাই।—পরিচয় দিতেই হইবে। সত্য পরিচয় দিবেন কি? সত্য না বলিলে ত নিস্তার নাই। তাঁহাকে যে ওয়ালটেয়ারের সকল লোকেই চিনে। তিনি মিথ্যা বলিলে, অপরের নিকট তাঁহার সত্য পরিচয় পাইয়া, তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া ঘৃণা করিবে। তখন তিনি তাহাদিগের নিকট মুখ দেখাইবেন কি রূপে? অতএব তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সত্য

বলিতেই বাধা হইলেন। বলিলেন, "আমার নাম? আমার নাম আপনি জিজ্ঞাসা করছেন? আমার নাম প্রাণকান্ত বসু—আপনি আমাকে প্রাণকান্ত বাবু বলবেন।"

প্রাণকান্ত! সুকুমারী কি কাহাকেও প্রাণকান্ত বাবু বলিতে পারিবে? প্রস্তাবটা শুনিয়া ব্রীড়ারাগে তাহার কপোলদেশ চিত্রিত হইয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া, এবং তাহার কারণ উপলব্ধি করিয়া, ডাঃ বসু সত্বর আপনাকে সংশোধিত করিয়া কহিলেন, "পূরা নামটা না বলে, সংক্ষেপে বরং পি, কে, বাবু বলবেন।"

সুকুমারী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে বেড়াতে আসবেন ত?"

ডাঃ বসু। নিশ্চয় আসব।

সুকুমারী। আমরাও আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে আসব।

ডাঃ বসু। আমার স্ত্রীর সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয়, তাহলে আপনাকে কিছুকাল বিলম্ব করতে হবে; কেননা এখনও এই উপাদেয় সামগ্রীটি আমি সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

সুকুমারী। তাহলে একদিন বাবার সঙ্গে গিয়ে আপনার গৃহিনী-শূন্য গৃহই দেখে আসব। আপনি কোন সময় বাড়ীতে থাকেন?

ডাঃ বসু। তা বলবার ক্ষমতা আমার নেই। সে কথা আমার রোগীদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন।

সুকুমারী। ওঃ! আপনি একজন ডাক্তার। আমরা জানতাম না যে, এখানে একজন ভাল বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন।

ডাক্তার বসু বুঝিলেন যে তাঁহার কথা মিঃ গুপ্ত পত্নীর নিকট কখনই কহেন নাই।—হতভাগ্যরা এই কুহকিনীদের কুহকজালে পড়িয়া বন্ধুদের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। কিন্তু সুকুমারী তাঁহার বন্ধুত্বের পরিচয় জ্ঞাত না থাকায় তিনি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। এখন তাহার বিধবাবিবাহে আস্থা আছে কি না, তাহা তিনি অল্প-দিন মধ্যেই বুঝিতে পারিবেন; এবং বন্ধুকেও তাহা বুঝাইয়া প্রেমান্ধ বন্ধুর জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। আপন মনের দুষ্ট অভিপ্রায় মনের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া, তিনি হাসিমুখে সুকুমারীকে কহিলেন, "আমি ভাল ডাক্তার কি না, বলতে পারিনে; তবে চিকিৎসা আমার ব্যবসা, আর আমার ওষুধ খেয়ে যে অনেক লোক মরেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

সুকুমারী হাসিয়া বলিল, "এই সুদূর বিদেশে একজন স্বজাতি ডাক্তারের সঙ্গে দৈবক্রমে পরিচয় ঘটে যাওয়ায়, আমাদের বিশেষ লাভ হল।"

ডাঃ বসু। সেকালের লোক হলে বলতো, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ কুকুর রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। আমার মনে হয়, বিধাতা মনে মনে একটা মতলব এঁটে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই মতলবটা কি আমরা ক্রমে বুঝতে পারব। এখন আপনি অনুমতি করলে, আমি আমার রোগীর সন্ধানে যাব।

সুকুমারী। নমস্কার! বিদায়! মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসতে ভুলবেন না।

ডাক্তার বসু মনে মনে বলিলেন, "আসবো নিশ্চয়। কিন্তু তুমি মনে করো না যে, আমার উপর তুমি কখন কুহক-জাল বিস্তার করতে পারবে। তুমি কেবল তোমাকে চেনবারই সুযোগ দেবে। তোমাকে চিনে, বন্ধুকে তোমার স্বরূপ দেখিয়ে দেব। মূর্খ বুঝবে, কি অপদার্থের অন্বেষণে সে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" প্রকাশ্যে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "নমস্কার, বিদায়!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দুষ্ট অভিসন্ধি।

তোমরা বোধ হয় জান যে, দাম্পত্য প্রেমে ডাঃ পি, কে, বসুর কখনই কোনও আস্থা ছিল না। তিনি মনে করিতেন, কামিনীগণ নীচ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তিনী হইয়াই স্বামী অনুরাগিণী হইয়া থাকে; ভাবিতেন, তাহাদের তথাকথিত স্বামীভক্তির মূলে বিন্দুমাত্র স্বার্থহীনতা নাই—স্বার্থসিদ্ধিই রমণীগণের মূলমন্ত্র। মদমত্তা করিণীগণ যেমন যূথপতির গাত্র লেহন করিয়া থাকে, মানবীরা তেমনই স্বামিসেবাপরায়ণা হয়। মূর্খ, মুগ্ধ পুরুষগণও হীন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই স্বার্থপূর্ণ সেবাকে নিঃস্বার্থ প্রেম মনে করে; এবং তজ্জন্য সহস্র বিধানে পত্নীর মনবিমোহনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে; আহারে, বিহারে, আচ্ছাদনে, আভরণে রমণীর মনোরঞ্জন করিয়া কেবল তাহার স্বার্থপরতারই সিদ্ধি আনিয়া দেয়। পতিহীনা হইলে, বিধবার স্বার্থপরতা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। তখন নিশ্চয়ই সকল স্ত্রীর মনই অন্য পতি গ্রহণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজে সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বিধবাদের মন বাঁধা থাকে; ইচ্ছা থাকিলেও পতি গ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু যে সমাজে স্ত্রীগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বিধবা বিবাহের অবাধ সাধনায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানে বিধবাদের মানস চক্ষু

নিশ্চয়ই নিয়ত স্বামী অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায় ; এবং একটি সুবিধা-মত পতির সন্ধান পাইবা মাত্র, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠলগ্না হয়। এখানে আমরা যাহা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা সমস্তই ঐ দুষ্ট ডাক্তার প্রাণকান্তের মত। অয়ি আমার সুন্দরী ও সর্ব্ব-গুণময়ী পাঠিকাগণ! তোমরা যেন উহা আমার মত মনে করিয়া আমার উত্তমাঙ্গে সম্মার্জ্জনী প্রয়োগের ব্যবস্থা করিও না।

বিধবাদিগের সম্বন্ধে উপরিউক্ত অদ্ভুত বিশ্বাস লইয়া ডাঃ পি, কে, বসু প্রায় প্রত্যহই বিধবা সুকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কিন্তু বিধবা সুকুমারী যে বাস্তবিক বিধবা নয়, এ কথা কখনই তাহাকে জানাইতেন না।

কখনও মিঃ অরুণোদয় দত্তের আহ্বানে ডাঃ বসু তাঁহাদের বাটীতে আহার করিতেন। তাঁহার গৃহিণীহীন গৃহে, তিনি অন্যের গৃহিণীগণকে আহারে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু মোটরগাড়ী পাঠাইয়া, তিনি মাঝে মাঝে মিঃ দত্তকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতেন ; এবং তৃপ্তিকর আহারে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিতেন ; আর মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট ফলের বা পুষ্পের ডালা পাঠাইয়া মহিলাদ্বয়ের মনোবিনোদন করিতেন। এইরূপে পক্ষকাল মধ্যে দত্ত পরিবারের মহিত ডাঃ বসুর বিশেষ সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইল।

ক্রমে ডাক্তার বসু বুঝিলেন যে, তিনি সুকুমারীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিদেশে স্বদেশীয় সজ্জনের সঙ্গলাভ করিয়া, সুকুমারী সত্যই অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছিল। কিন্তু সে

স্বার্থপর নারীজাতীয়া এবং নিশ্চয় স্বার্থসিদ্ধি অভিলাষিণী ; অতএব ডাঃ বসু এই প্রীতিটা অত্যন্ত বক্র দৃষ্টিতে দেখিলেন। সুকুমারীর প্রসন্ন নেত্রপাতে তিনি স্বার্থপরতার ছায়াপাত লক্ষ্য করিলেন ; তাহার প্রস্তুত চায়ে স্বার্থপরতার গন্ধ পাইলেন। তাহার সরস কথা শুনিয়া, তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখভঙ্গিমা দেখিয়া, তাহার পরিধান বস্ত্রের পারিপাট্য লক্ষ্য করিয়া, ডাঃ বসু ভাবিলেন যে, উহা তাঁহাকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিবার ফাঁদ মাত্র ; নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য বিধবা সুকুমারীর মানস কন্দরে একটা গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, শিকারের সন্ধান-প্রাপ্ত সিংহের ন্যায় লুক্কাইত আছে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, ডাঃ বসু মনে মনে বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিলেন ; ভাবিলেন, হায় হায়! এই স্বার্থপরদিগকেই প্রেমময়ী মনে করিয়া, পুরুষগণ প্রমত্ত হইয়া উঠে ;—এই আত্মসুখিনীগণের শ্রীপদে সর্ব্বস্ব দান করিবার জন্য দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটে। যে সুকুমারী আজ মন হইতে স্বামীর স্মৃতি সঞ্চিত আবর্জ্জনার ন্যায় ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, এবং আর একটিকে গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছে,—তাহারই সন্ধানে তাঁহার বন্ধু দেশে বিদেশে উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ;—ভো ভো হস্তীমূর্খ! কবে তোমার মোহের নিশা পোহাইবে, কবে প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিবে ?

বন্ধুকে কুহকিনীর যথার্থ মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য, ডাঃ বসুর মনে হঠাৎ একটা দুষ্ট অভিসন্ধি জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে,

প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, সুকুমারী অতি সহজেই তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মতা হইবে। তখন বিবাহের সব উদ্যোগ শেষ করিয়া, তিনি বন্ধুকে ডাকিয়া পত্নীর বিবাহবেশ দেখাইবেন, এবং বুঝাইয়া দিবেন, কি অপদার্থকেই তিনি হৃদয়ের রত্ন সিংহাসনে দেবীর ন্যায় বসাইয়া রাখিয়াছেন। আর সুকুমারীকে সেই সময় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিবেন যে, যে জাতি স্বামীর স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া অন্যকে পতিত্বে বরণ করিতে যায়, তাহারা কথনই তাঁহার চক্ষে স্পৃহার সামগ্রী হইবে না।

মিঃ অরুণোদয় ও দত্ত তাঁহার পত্নী দেখিলেন যে, ডাঃ বসুর সহিত সুকুমারীর বন্ধুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দেখিয়া তাহারা প্রীত হইলেন; এবং স্মরণ রাখিলেন যে, এই বন্ধুত্বের ইন্ধনে তাঁহাদের পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ ঘৃতাহুতি নিক্ষিপ্ত হইলেই, উহাতে সহজেই প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। তাঁহারা যদি এই প্রেমাগ্নি জ্বালাইতে সমর্থ হন, আর সুকুমারী যদি স্বামীর শেষ আজ্ঞা স্মরণ করিয়া বিবাহে সম্মতা হয়, তাহা হইলে সে, ডাঃ বসুর ন্যায় সচ্চরিত্র ও অর্থবান পাত্রের হস্তে পড়িয়া, আবার সুখী হইতে পারিবে; এবং তাহার দারুণ বৈধব্য ক্লেশ অপনীত হইবে।

অতএব আপন অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার অভিলাষে ডাঃ বসু যেমন একদিকে সুকুমারীকে বিধবা বিবাহে সম্মত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করিয়া, তাহার পিতামাতাও তেমনই সেই উদ্যোগে সহায়তা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু সুকুমারী সহজে ধরা দিল না। বোধ হয়, সে স্বামীকে এখনও ভুলিতে পারে নাই, সেই স্বামীর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া সে অন্যকে কিরূপে ভল বাসিবে? সুকুমারী যে কারণে ধরা দিল না, তাহা আমরা যেমন বুঝিলাম, ডাঃ বসু সেরূপ বুঝিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, সুকুমারী পাকা খেলোয়াড়, সে একটু খেলা দেখাইতে চায়। ইহা বুঝিয়া, তিনি ভাবিলেন, বেশ ত, মাছ যখন টোপ গিলিয়াছে, তখন একটু খেলাইতে ক্ষতি কি? তিনি সুকুমারীর নাসিকায় কৌশলের বড়শী বিঁধিয়া, তাহাকে প্রেমের সরোবরে খেলাইতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পাকা চাল।

এই সময় একদিন সুকুমারী তাহার পিতার নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবা, ডাক্তার বসু বলছেন যে, তাঁর মোটর গাড়ীতে চড়িয়ে একদিন আমাদিকে বিজিয়ানাগ্রামের বাগান দেখিয়ে আনবেন। আর যদি আমরা হাজারটা সিঁড়ি উঠতে পারি, তাহলে, তিনি বিজিয়ানাগ্রাম থেকে আমাদিকে সিংহাচল পাহাড়ে নিয়ে যাবেন। সেখানে নৃসিংহদেবের মন্দির আর অন্যান্য মণ্ডপ আছে। তাঁর মুখে শুনলাম, মণ্ডপগুলি নাকি ভারি সুন্দর। ডাঃ বসুকে কি বলবো, বাবা?"

কন্যার ভবিষ্যৎ হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা ভাবিলেন, উদ্যান ভ্রমণে, পর্ব্বতারোহণে কন্যার সহিত ডাঃ বসুর মিলনের আরও সুবিধা হইবে; অতএব মিঃ দত্ত বলিলেন, "বিজিয়ানাগ্রামে যেতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা এই বুড়ো হাড় নিয়ে এত গুলো সিঁড়ি ভেঙে কি সিংহাচলে উঠতে পারবো! আর সিংহাচলে গেলেও ত আমরা নৃসিংহদেবের মন্দির দেখতে পাব না; হিন্দুর ঠাকুরবাড়ীতে আমাদের মত অহিন্দুকে ঢুকতে দেবে কেন?"

সুকুমারী। মন্দির আমরা বার থেকে দেখবো। কিন্তু

মন্দির না দেখলেও সিংহাচলে ওঠায় বেশ একটু আমোদ পাওয়া যাবে। ডাঃ বসু বল্‌লেন সিঁড়ির দু'ধারের দৃশ্য অতি মনোরম।

মিঃ দত্ত। বেশ, তাহলে সেখানে যাবার একটা দিন স্থির করে ফেল।

সুকুমারী। ডাঃ বসু বলছেন কালই যাবেন। সকাল রোগী-দের দেখে, ব্রেকফাষ্টের পরই তিনি মোটর নিয়ে এখানে আসবেন।

মিঃ দত্ত। তার চেয়ে তাঁকে কেন আমাদের এখানেই ব্রেক-ফাষ্ট করতে বল না।

উপরিউক্ত কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল যে, মিঃ দত্ত কন্যার হিতকল্পে একজন পাকা লোকের চাল চালিতেছিলেন। ডাঃ বসুও তাঁহার দুষ্ট অভিসন্ধি বক্ষে লইয়া একজন পাকা প্রেমিকের চালই চালিতে-ছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুত্বের প্রতিদান, না প্রেম ?

সুকুমারী পিতার সম্মতি বহন করিয়া হাসিমুখে ড্রইং রুমে আসিল।

সেখানে সুকুমারীর আগমন প্রতীক্ষায় একাকী বসিয়া ডাঃ পি, কে, বসু মনে মনে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। আনন্দিত মনে ভাবিতেছিলেন যে, তিনি যে ছলনাময় প্রেমরঙ্গের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা এ যাবৎ নির্ব্বিরোধেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ; এই অভিনয়ের শেষ অঙ্কে যখন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হইবে, তখন তাঁহার বন্ধু মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত কি দেখিবেন ? হো হো হো ! দেখিবেন, যে নারীপ্রেম একটা দুর্গন্ধ রাখিয়া ন্যাপথালিনের গোলকের মত উবিয়া গিয়াছে। দেখিবেন যে, যাহাকে এতদিন প্রেমময়ী মনে করিয়া, দেবীপ্রতিমার ন্যায়, অলঙ্কারের ও আভরণের অর্ঘ্যে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে স্বার্থপরতার তৃণ ও মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছু নাই।

সুকুমারীকে সস্মিত মুখে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ডাঃ বসু বুঝিলেন যে, মিঃ অরুণোদয় দত্ত সিংহাচল ভ্রমণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তিনি অভিসন্ধি-সিদ্ধির দুষ্ট হাসি গোপন

করিয়া, প্রেমময় মিষ্ট হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? মিঃ দত্ত আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন ত?"

সুকুমারী কহিল "হাঁ, বাবা যাবেন বলেছেন। আপনি কিন্তু বাড়ীতে ব্রেকফাষ্ট না করে এখানেই করবেন; কেমন? আর টিফিন বাস্কেটটা আমরা এখান থেকেই গুছিয়ে নেব।"

ডাঃ বসু উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বাঃ, বাঃ। আপনি একটি এঞ্জেল! কাল সিংহাচল ওলিম্পিয়াতে বসে, আপনার হাত থেকে স্বর্গীয় টিফিন খাওয়া যাবে। আজ তাহ'লে উঠি। আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরে, সকাল সকাল শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনার স্বর্গীয় টিফিনের স্বপ্ন দেখ্‌তে হবে।"

ভদ্রতার সহিত সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "আর একটু বস্‌বেন না?'

ডাঃ বসু মনে করিলেন, সত্যই সুকুমারী তাঁহার সঙ্গপ্রার্থিনী। তিনি আপন কণ্ঠ প্রেমরসে পরিসিক্ত করিয়া কহিলেন, "আপনি যদি বলেন যে, একটু বস্‌লে, আপনি সুখী হবেন, তাহলে আমি অনন্তকাল আপনার কাছে বসে থাকতে পারি।"

প্রেমপদ্ধতিপরিজ্ঞাতা সুকুমারী ডাঃ বসুর কপট প্রেমসিক্ত কণ্ঠের বাক্যে সত্য প্রেমেরই গন্ধ পাইল। সে তাহার ললাটপট চিন্তাচিত্রিত করিয়া ভাবিল, ডাঃ বসুর মনে সত্যই অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে না কি? সে কি বাক্যে বা কার্য্যে এমন কিছু করিয়াছে যাহার দ্বারা তাঁহার মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে পারে? সে সভয়ে ডাঃ বসুর মুখের দিকে চাহিল। কৈ, তাঁহার

কৌতুকদীপ্ত চক্ষে সে ত অনুরাগের আগ্রহময় দৃষ্টি দেখিল না! তবে হয়ত ডাঃ বসু কেবল মাত্র শিষ্টতার অনুরোধেই ঐ রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; তাঁহার অনুরাগ সম্বন্ধে সন্দেহ সুকুমারীর ভ্রমমাত্র। অতএব সে তাহার ললাটতল পুনরায় প্রসন্ন করিয়া হাসিমুখে বলিল, "অবশ্যই সুখী হব; কিন্তু আপনি অনন্তকাল আমার কাছে বসে থাকতে পারবেন না।"

ডাক্তার বসু মনে মনে বলিলেন, "তোমাদের জাতটাকে আমি খুব চিনি; তোমরা আমার দ্বারা যে সুখী হ'তে চাও, তা আমি জানি; আত্মসুখই যে তোমাদের সাধনা, তা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তাই, অনন্তকাল ত দূরের কথা, আমি তোমাদের কাছে দু'দণ্ডও বসতে প্রস্তুত নই। কেবল তোমাদের সম্বন্ধে আমার বোকা বন্ধুরত্নের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়া দরকার, তাই থিয়েটারের রাজপোষাকপরা নকল রাজার মত, প্রেমের পোষাক পরে প্রেমিক সেজে, তোমাদের কাছে বসে প্রেমের অভিনয় করি।" প্রকাশ্যে বলিল, "ব্যস্! আমি আর উঠছিনে। আপনার সুখটা যতক্ষণ না দুঃখে পরিণত হয়, ততক্ষণ বসে থাকবো।"

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি আমার কাছে থাকলে আমায় কখনও অসুখী করতে পারবেন না। যত বেশীক্ষণ থাকবেন তত আমার বেশী আহ্লাদ হবে। আপনি জানেন না, আপনাকে আমরা প্রাণের কত কাছে টেনে নিয়েছি, আপনাকে আমরা কত আপনার লোক ভাবি।"

ডাঃ বসু মনে মনে বলিলেন 'ভো ভো, বন্ধু! এস, এসে

শুনে যাও, তোমার অভিন্নাত্মা প্রেমময়ীর মধুর ভাষণ! এখন তোমাকে নয়, আমাকে তিনি প্রাণের কাছে টেনে নিয়েছেন।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সর্ব্বদা আপনার—তোমার কাছে থাকবার পাকা অনুমতি পাবার প্রত্যাশা করতে পারি কি?"

ডাঃ বসুর শেষ বাক্য শুনিয়া সুকুমারী আবার ভ্রুকুঞ্চিত করিল। তাহাদের প্রতি ডাঃ বসু বন্ধুত্বের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইতে যাইয়া, তাঁহার সৌহার্দ্যের প্রতিদানস্বরূপ সে যে কথাগুলা বলিয়াছে, তাহা বলা ভাল হয় নাই। সে ভাবিল যে ডাক্তার বসুর প্রেমনিষিক্ত কর্ণে তাহা অন্য সুরে ধ্বনিত হইয়াছে; তাহার দ্বারা তাঁহার অনুরাগের বহ্নিতে ফুৎকার দেওয়া হইয়াছে। এই অভাবনীয় ব্যাপারে সুকুমারী অত্যন্ত লজ্জিতা হইল। সে লজ্জাবনত মুখে কহিল, "আপনার কথার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

সুকুমারীর ললাটকুঞ্চন ও সলজ্জভাব দেখিয়া ডাঃ বসু ভাবিলেন যে উহা দুষ্টার প্রেমাভিনয় মাত্র। তাহার কথা শুনিয়া ভাবিলেন যে, ধূর্ত্তা কথার প্রস্তাবটা একেবারে পাকা করিয়া লইতে চায়। বিবাহের প্রস্তাবটা পাকা হইবে বটে, কিন্তু ডাঃ বসুকে কোন পারদর্শিনী বিবাহবন্ধনে বাঁধিবে? সুকুমারী ত পারিবেই না; কেন না ডাঃ বসু জানিতেন যে তাহার মূর্খ পতি এখনও জীবিত আছেন; অন্য কোনও পারদর্শিনীও তাহার মরুৎ সদৃশ উন্মুক্ত মনকে, পরিণয় শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিতে পারিবে না। মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া ডাঃ বসু আসন ত্যাগ

করিয়া বলিলেন, "তুমি এইখানে একটু বসো ; আমি তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে এসে, আমার কথার অর্থ তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব।"

এ কি এ? ডাঃ বসু কি সত্যই আজ হঠাৎ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন? সুকুমারী কি বলিবে? অতি বিস্ময়ে ও লজ্জায় তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

ইত্যবসরে ডাঃ বসু, মিঃ দত্তের সন্ধানে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

ডাঃ বসু প্রস্থিত হইলে, সুকুমারী ভাবিল, আজ সে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অবসর দিবে না। সে আপন শয়ন কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুকুমারীর চিন্তা।

শয়নকক্ষের নিভৃতে বসিয়া সুকুমারী চিন্তাসাগরে ঝাঁপ দিল।

পরদিন আবার যখন ডাঃ বসুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন পিতার অনুমতির বলে, তিনি যদি সত্যই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, তখন সুকুমারী কি করিবে? তাহার পক্ষে ডাঃ বসু সর্ব্বাংশে সুপাত্র; তেমন রূপবান অর্থশালী ও সচ্চরিত্র লোককে জামতারূপে পাইতে, সুকুমারীর পিতার মনে সত্যই একটা কামনা থাকিতে পারে। তাহার উপর সুকুমারীর তরুণ বয়সের অভিমত স্মরণ করিয়া পিতার মনে হয়ত একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, সুকুমারী স্বামীর শেষ আজ্ঞা পালন জন্য পুনরায় বিবাহ করিতে অসম্মত হইবে না। তাহাকে ডাক্তার বসুর সহিত একটু বেশীরকম মেশামিশি করিতে দেখিয়া হয়ত সেই ধারণাটা আরও প্রবল হইয়াছে। সুতরাং পিতার নিকট ডাঃ বসু নিশ্চয়ই সম্মতিলাভ করিবেন। তাহার সম্মতি লইয়া যখন ডাঃ বসু সুকুমারীকে বিবাহ করিতে চাহিবেন, তখন সে কি বলিবে? সে ত তাহাতে সম্মত হইতে পারিবে না। মৃতস্বামীর পবিত্র ও প্রেমময় স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, সে ত অন্যকে সর্ব্বান্তঃ-

করণে ভালবাসিতে পারিবে না। যাহাকে ভালবাসিতে পারিবে না, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে সে কি কথন মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারিবে ?

তথাপি ডাঃ বসুর ন্যায় একজন সুশিক্ষিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিলে, হয়ত সুকুমারী নিতান্ত অসুখী হইবে না ; হয়ত তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের ভার কিছু লঘু হইবে। তাহার প্রতি ডাঃ বসুর যদি বাস্তবিক অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, সেই দুষ্প্রাপ্য অনুরাগ ত সুকুমারী হেলায় ফেলিয়া দিতে পারে না। কিন্তু মৃতস্বামীর অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে অন্য অনুরাগ গ্রহণের আর স্থান কৈ ? মৃতস্বামীর বুকভরা ভালবাসায় যে সুকুমারীর হৃদয় এখনও কাণায় কাণায় পূর্ণ রহিয়াছে। সে কি করিবে ? তাহার চিরপূজ্য উপদেষ্টা তাহার জীবনের ও মরণের আরাধ্য দেবতা, তাহার সর্ব্বার্থসার স্বর্গস্থ স্বামী তাহাকে কি করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ? স্বামীর সেই শেষ আদেশ পালন করা কত কঠিন তাহা মনে করিয়া সুকুমারী শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা কঠিন বলিয়া ত অবহেলা করা চলে না।—স্বর্গে বসিয়া স্বামী আপন আজ্ঞার প্রতি তাহার পরিত্যক্তা পত্নীর অবজ্ঞা দেখিয়া কি মনে করিবেন ? স্বামীদেবতার আজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপে সুকুমারীর ভবিষ্যৎজীবন হয়ত জর্জ্জরিত হইয়া যাইবে।

এদিকে স্বামীর অলঙ্ঘনীয় আদেশ লঙ্ঘনের আশঙ্কা, অন্য দিকে প্রেমহীন নূতন বিবাহের ভয়, পরস্পর বিরোধী দুইটা ভীতির মধ্যে পড়িয়া তাহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইতে লাগিল ; যেন

দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী শ্বাপদের মধ্যে পড়িয়া একটা রক্তাক্ত দেহ ছাগশিশু পিষ্ট হইতে লাগিল। 'হাঁ' ও 'না' এর ঘাত প্রতিঘাতে তাহার পঞ্জর যেন প্রাবৃটপ্রবলা স্রোতস্বতীর সৈকতের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সে আপন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিল না।

নিজে কর্ত্তব্য স্থির না করিতে পারিয়া সে তাহার এক বাল্যসখীকে পত্র লিখিল। এই বাল্যসখীর পরিচয় আমরা যথাসময়ে প্রদান করিব। তাহাকে সুকুমারী লিখিল, "ভগিনী প্রাণতোষিণী! তোমার মত সুহৃদ আমার আর কেহ নাই। তাই আজ মহা বিপদে পড়িয়া সর্ব্বাগ্রে তোমারই কথা মনে পড়িল। আমার বিপদের কথা পত্রে লিখিবার নয়। যদি উপায় থাকিত আমি নিজে কলিকাতায় যাইয়া তোমাকে আমার বিপদের কথা বলিতাম। আমি নিরুপায় বলিয়া তোমাকেই আমার কাছে আসিতে হইবে। আসিয়া আমার দুঃখের কথা স্বকর্ণে শুনিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে তোমাকে আমি যেমন বুদ্ধিমতী মনে করিয়া আসিয়াছি, অন্য কাহারও সম্বন্ধে আমার কখন সেরূপ উচ্চ ধারণা হয় নাই। তুমি যদি কয়েক দিনের জন্য ওয়ালটেয়ারে আসিয়া আমাকে সুবুদ্ধি প্রদান কর, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। এস, ভগিনী, তোমার বাল্যসখীকে উদ্ধার করিতে এস।'

সখী প্রাণতোষিণীকে পত্র লিখিয়াই সুকুমারী মনে করিল যেন তাহার বিপদের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তাহার পর

পরদিন সিংহাচলে যাইবার উদ্যোগে নিশ্চিন্ত মনে সে আপনাকে নিযুক্ত করিল।

তোমরা বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, স্বামীর আদেশ পালন সম্বন্ধে সুকুমারী যেরূপ চিন্তায় পতিত হইয়াছিল, অন্য কেহ হইলে, সেরূপ চিন্তার কোন কারণই দেখিত না; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া ফেলিত। তোমরা বোধ হয় জান যে, স্বামী বা অন্য কোনও গুরুজন যখন আমাদিগকে কোনও প্রকার আদেশ করেন, তখন সেই আদেশের বাক্যার্থ মাত্র গ্রহণ করিলে চলিবে না, আদেশের সহিত আদেশকারীর আন্তরিক ইচ্ছারও অনুসন্ধান করিতে হইবে; এবং সেই আন্তরিক ইচ্ছানুযায়ীই আমাদের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে; তাহাতেই গুরুজন সুখী হইবেন। ক্ষণিক ক্রোধের উত্তেজনায় জননী যখন বাক্যের দ্বারা পুত্রকে যমালয়ে যাইতে আদেশ করেন, তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অন্তরের কোনও অংশে সেরূপ অভিলাসের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তখন পুত্র মাতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সত্যই যমালয়ে না যাইয়া, যদি মাতৃক্রোড় আলো করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে, তিনি তাহাতে আনন্দিতা হইয়া থাকেন। পত্নীর পাককার্য্যে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া, পতি যখন বিরক্তি বিজড়িত কণ্ঠে আদেশ করেন, 'তুমি আর রাঁধিও না,' তখন সেই আদেশের বাক্যার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া, কোনও পতিব্রতা রন্ধন কার্য্য পরিত্যাগ করেন না, বরং উত্তম ব্যঞ্জন সকল রাঁধিয়া স্বামীকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। সুকুমারী

যেদিন স্বামীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যে সে কখনই বিধবা বিবাহ করিবে না, সেই দিনইত সে তাঁহার প্রেম ও হর্ষ প্রফুল্ল মুখে তাঁহার অন্তরের অভিলাষ অবগত হইতে পারিয়াছিল। এখন সুকুমারী যদি অন্যের ন্যায় বুঝিত যে স্বামীর বাক্যাদেশ লঙ্ঘন করিয়া, তাহার অন্তরাভিলাষ পূর্ণ করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তাহাকে আজ চিন্তিতা হইতে হইত না। এবং এই চিন্তাসাগর হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সখী প্রাণতোষিণীকে ডাকিতে হইত না। আরও সুকুমারী যদি বুঝিত যে, তাহাকে পুনঃ পতিগ্রহণাভিলাষিণী আত্মসুখসন্ধানী রিপুপরতন্ত্রা মনে করিয়া স্বামী তাহার ভবিষ্যৎ ঐহিক সুখের কামনায় তাহাকে যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা চিত্তবিজয়িনী পতিব্রতচারিণী প্রণয়িণীর পক্ষে পালনীয় নহে, তাহা হইলে তাহাকে অকারণ চিত্তপীড়া ভোগ করিতে হইত না; তাহা হইলে, সুবুদ্ধি সংগ্রহের জন্য বাল্যসহচরী প্রাণতোষিণীকে আহ্বান না করিয়া আপনিই কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিধবা বিবাহের প্রবন্ধ।

কক্ষান্তরে যাইয়া ডাঃ পি, কে, বসু মিঃ অরুণোদয় দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই অসময়ে ডাঃ বসুকে আপন কক্ষে সমাগত দেখিয়া, তাঁহার অভিপ্রায়টা কি তাহা বুঝিতে মিঃ দত্তের এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটে নাই। তিনি ডাঃ বসুকে আপনার নিকটবর্ত্তী এক আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। ডাঃ বসু তাহাতে উপবেশন করিয়া মুখভঙ্গিমায় ও বাক্যে বেশ একটু প্রণয়াভিনয় দেখাইলেন; এবং সুকুমারীকে বিবাহ প্রস্তাব করিবার সম্মতি অতি সহজেই তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইলেন। এই সহজ সম্মতি প্রাপ্ত হইবার পর, প্রণয়াভিনয়ের চির-প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, তিনি নতজানু হইয়া মিঃ দত্তের পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন।

মিঃ দত্ত দাঁড়াইয়া ডাঃ বসুকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং যথোপযুক্ত আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, "আমি জানি, তুমি প্রস্তাব করলেই সুকু তোমাকে গ্রহণ করতে সম্মত হবে। একে ত আগ থেকেই সে বিধবাবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতিনী, তার উপর স্বামীর মৃত্যুকালের আদেশ!—তোমার মত সৎপাত্র তাকে বিয়ে করতে চাইলে, সে কখনই সে আদেশ লঙ্ঘন করবে না। স্ত্রীস্বাধীনতা সভায় সে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করে-

ছিল। তখন সংবাদপত্রে সেই সারগর্ভ প্রবন্ধটা প'ড়ে কলকাতার ভদ্রসমাজে বেশ একটু সাড়া পড়ে গিয়াছিল। ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে তা নিয়ে বেশ একটু আলোচনা চলেছিল। আমি প্রবন্ধটা একখানা ছোট কেতাবের আকারে ছাপিয়েছিলাম। তার দু' একখণ্ড এখনও আমার কাছে আছে। তোমাকে এক কপি দেব এখন। তুমি পড়ে দেখো, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তার মত কি উদার! ঐ প্রবন্ধের এক জায়গায় সে স্পষ্টই বলেছে যে, যদি কোন বিধবা অন্যায় লজ্জার বশবর্ত্তী হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে না চায়', তাহলে জোর ক'রে তার বিয়ে দেওয়া সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। সমাজ, সমাজের একটি লোককেও দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখবেন না।" এই বলিয়া, তিনি পার্শ্বস্থ টেবিল হইতে এক খণ্ড পুস্তিকা লইয়া, ডাঃ বসুর হস্তে অর্পণ করিলেন।

ডাঃ বসু ভাবী শ্বশুরের প্রতি ভাবী জামাতার শিষ্টাচার দেখাইয়া নতমস্তকে ও নীরবে মিঃ দত্তের বাক্য শ্রবণ করিলেন। পরে পুস্তকটি ভক্তিপুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, এবং পুনরায় মিঃ দত্তকে নমস্কার করিয়া ড্রইংরুমে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু সুকুমারী ত পূর্ব্বেই আপন শয়নকক্ষে যাইয়া চিন্তা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল।

সে তথ্য অবগত হইতে না পারিয়া, ডাঃ বসু মনে করিলেন যে, সুকুমারী হয়ত কোনও কার্য্যের জন্য অন্য কক্ষে গিয়াছে; এখনই প্রত্যাগতা হইবে। অতএব তিনি তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় ড্রইংরুমে বসিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া, ডাঃ বসু অন্য কার্য্যাভাবে সুকুমারীর প্রবন্ধ পুস্তকের পত্র সকল পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কখনও কোনও পত্রের ছত্রবিশেষে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এক স্থানে তিনি দেখিলেন নিম্নের কয়েকটি পংক্তি লিখিত আছে।—

"দীন হীন ভারতের আর সে দিন নাই, যেদিন আমাদের দীনা ও ক্ষীণা প্রপিতামহীগণ অহরহ পরিশ্রম করিয়া পুরুষের অমানুষিক অত্যাচার নির্ব্বাক বদনে সহ্য করিতেন, যেদিন ধান ভানিয়া কদলীকাণ্ডতুল্য উরুদ্বয় ভীমসেনের গদার ন্যায় কঠিন করিয়া ফেলিতেন; যেদিন বাটনা বাটিয়া কামিনীগণ আপনদের পুষ্পমালার ন্যায় কোমল বাহুলতা শালকাণ্ডের ন্যায় কর্কশ ও দৃঢ় করিতেন; যেদিন তাঁহারা বেড়ী ধরিয়া আপনাদের পুষ্পসন্নিভ হস্তদ্বয়কে লৌহফলকে পরিণত করিতেন; যেদিন কক্ষে গুরুভার কলসী বহিয়া আপনাদের পরিপাটী মাংসল কটিতট কাঠির ন্যায় শুষ্ক করিয়া ফেলিতেন; যেদিন—ছি! ছি! কি লজ্জার কথা—কামিনীগণ ঘুঁটে দিবার জন্য আপন কোকনদকল্প করে গোময় লিপ্ত করিতেন। একদিন নহে, দুই দিন নহে, সুদীর্ঘ অশীতি বৎসর বাঁচিয়া তাঁহারা সকলেই এই অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতেন। এখন ইংরাজের অধীনে এই স্বর্ণময় ভারতে আমরা স্বাধীন হইয়াছি। আমাদের প্রেমময় জীবনচালনার রশ্মি আমাদের নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা আর সেকালের দুর্ব্বলা অবলা নহি। এক্ষণে আমরা সুশিক্ষিতা হইয়াছি। আমাদের অদম্য ক্ষমতার ভয়ে ভীত হইয়া, কাপুরুষ পুরুষেরা এখন আর পত্নী বর্ত্তমানে অন্যা

পত্নী গ্রহণ করিতে সাহস করে না। পাপিষ্ঠ পুরুষজাতি এখন বুঝিয়াছে যে ভার্য্যার মৃত্যুর পর, তাহারা যদি অন্য গৃহিণী গৃহে আনিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমরাও পতিহীনা হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিব; নিশ্চয় করিব। হে আমার স্বদেশবাসিনী সুকোমলা ভগিনীগণ! তোমরা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হও। মৃতপতির মৃত্যুমলিন মুখের ধ্যান করিয়া, তোমাদের কুসুমিত হৃদয়োদ্যানকে শ্মশানে পরিণত করিও না; স্বামীর ভস্মীভূত অবয়বের চিন্তা করিয়া তোমাদের উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রকে শুষ্ক মরুভূমি করিও না। এস ভগিনীগণ! ছুটিয়া এস; পাশ্চাত্য সভ্যতার নূতন আলোকে জীবন লাভ কর। মরা পতির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবন্ত নবীন পতি গ্রহণ করিয়া তোমাদের অন্ধকারময় জীবন আলোকিত কর।"

অন্য এক পত্র খুলিয়া ডাঃ বসু পড়িলেন, "সন্তানহীনা বিধবারা ধরণীকে লোকময়ী করিবার জন্য আবার বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিবেন; এবং নিজে মাতৃত্ব লাভ করিয়া রমণীজীবনের পূর্ণতা লাভ করিবেন। পবিত্র মাতৃস্নেহের স্বর্গীয় স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য, আমি বলি, প্রত্যেক অপুত্রবতী বিধবারই বিবাহ করা উচিত। সেই বিধবাই ধন্য, যে ক্রোড়ে সন্তান ধারণ করিয়া জননীনাম গ্রহণ করিতে পারে। ভগবান আমাদিগকে জননী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন; মূর্খ সমাজের অত্যাচারে আমরা যদি ভগবানের সাধু অভিপ্রায় বিফল করি, তাহা হইলে, জানিও ভগিনীগণ, তাঁহার রোষবহ্নি বজ্রাঘাতের ন্যায়

আমাদের মস্তকে পতিত হইবে। ইহা জানিয়া, হে আমার স্বদেশ-বাসিনী নিঃসন্তান বিধবা ভগিনীগণ, তোমরা সতর্ক হও, সত্বর পতিগ্রহণ করিয়া সন্তান-জননী হইতে যত্নবতী হও।"

প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশদ্বয় পাঠ করিয়া ডাঃ বসু মনে মনে হাসিলেন; এবং বুঝিলেন যে, সন্তানহীনা সুকুমারী বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ মত মনোমধ্যে পোষণ করিয়া বিধবাবিবাহে সম্মতা হইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না; প্রস্তাবটা উত্থাপন করিবা-মাত্র সে, মৎস্যের সন্ধান প্রাপ্ত মার্জ্জারের ন্যায়, লম্ফ প্রদান করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। এবং জনসমাজে প্রচার করিবে যে, মৃতস্বামীর মৃত্যুকালীন আজ্ঞা লঙ্ঘনীয় নহে, সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছায় সে পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। জনসমাজে সে যাহাই প্রকাশ করুক, একবার তাহার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতা হইলেই ডাঃ বসুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাহার পর? তাহার পর ডাঃ বসু কি করিবেন? তাঁহার মূর্খ বন্ধুকে আনিয়া, সেই পুনঃ বিবাহাভিলাষিণীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেখাইবেন, কি হৃদয়হীনাগণকেই নির্ব্বোধ পুরুষ তাহাদের সমস্ত হৃদয় অকাতরে দান করিয়া থাকে। দেখিয়া বন্ধুর চিরকালের কুহকজাল মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া যখন ডাঃ বসু দেখিলেন যে, সুকুমারী ড্রইং রুমে ফিরিয়া আসিল না, তখন তিনি ভাবিলেন যে অভিলষিত বিবাহের প্রস্তাবটা শুনিবার জন্য সত্বর তাঁহার নিকট প্রত্যাগত না হওয়াটা, বোধ হয়, প্রণয়াভিনয়ের একটা

অঙ্গ ;—আপনাকে লজ্জাশীলা দেখাইবার জন্য, ইহা লজ্জাহীনাদের একটা কপট লজ্জার ভান মাত্র ; এই কপটতার বুদ্বুদ তিনি একদিন ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া দিবেন।

তিনি আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন ; কিন্তু সুকুমারী তখনও দেখা দিল না। তখন তিনি বাটী ফিরিবার জন্য গাত্রোত্থান করিয়া মনে করিলেন যে, সুকুমারী যখন তাহার কৌশলের জালে ধরা পরিয়াছে, তখন একদিন বিলম্বে সিংহাচল পর্ব্বতের নির্জ্জন পথে বা অন্য কোনও স্থানে, সুযোগ মত, বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কোনও ক্ষতি হইবে না। সুতরাং তিনি আনন্দচঞ্চল পদবিক্ষেপ করিয়া, শিষ দিয়া মোটর গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারীর প্রফুল্লতা।

আমরা দেখিয়াছি, প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেক সময় আমাদের প্রাণ স্পর্শ করে। মেঘ-পরিব্যাপ্ত অন্ধকার আকাশ আমাদের মনের মধ্যে বিষাদের ছায়াপাত করে, আবার সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রকৃতির বাহ্যিক প্রফুল্লতা আমাদের অন্তর মধ্যেও আনিয়া দেয়। বর্ষার বৃষ্টিপাতের সহিত আমাদের অশ্রুবর্ষণের ইচ্ছা জন্মায়, আবার বসন্তের পুষ্পশোভায় আমাদের হৃদয় মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ উঠে; পুষ্পময়ী প্রকৃতির প্রসন্ন মুখ দেখিয়া প্রসন্নতায় হৃদয় ভরিয়া যায়।

সেদিন ওয়ালণ্টেয়ারে প্রকৃতি দেবী অত্যন্ত প্রসন্না হইয়াছিলেন। মস্তোকপরি নীরদশূন্য নীলাকাশ স্বর্গের হাসি হাসিতেছিল; দিগন্তপ্রান্তে অম্বুধির অসীম নীলবক্ষে, অচ্যুতবক্ষে অতি বৃহৎ কৌস্তভমণির ন্যায় প্রভাতার্ক সমুদ্রের উদ্বেলিত বক্ষে স্বর্ণময় রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিল। মিহির দেবের স্বর্ণরথে সপ্ত অশ্ব সংযোজিত ছিল; তাহাদের দ্রুতবিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে যেন গগনমার্গে রক্তরজঃ উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল; তাহাতে নভঃপ্রান্ত ও অর্ণবাম্বু উভয়ই উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। পশ্চিমে শীতশিশির শীতল লতাগুল্মময় শৈলোচ্চয় প্রথম সূর্য্যকিরণ

অঙ্গে মাখিয়া নব অলঙ্কারভূষিত বালকের ন্যায় অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল; শিশুগণ ক্ষুদ্র করপল্লব নাড়িয়া যেমন মাতার নিকট হইতে সদ্য প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, শৈলজাত বৃক্ষসকল শাখা বাহু বিস্তার করিয়া পল্লবপুটে সূর্য্যের তপ্তরশ্মিটুকু তেমনই গ্রহণ করিতেছিল। শৈলতলে একটা 'কেশুনট' বৃক্ষের পত্রমধ্যে লুকাইয়া পত্ররমগণ, যেন জনান্তিকে অরুণের বন্দনা সঙ্গীত গাহিতেছিল। সুকুমারী প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সেই প্রাকৃতিক আনন্দে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; সেই আনন্দময় নীলাকাশে তাহার প্রাণপক্ষিণী যেন পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িতে চাহিতেছিল; তাহার চক্ষু দুইটা যেন আনন্দের মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়াছিল; আনন্দরাগে তাহার গণ্ডস্থল রঞ্জিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বদিনের দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণ অপনীত করিয়া, এবং বাহিরের আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করিয়া সুকুমারী বাটী ফিরিল; এবং মহা উৎসাহের সহিত সিংহাচলে যাইবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল। সে দুইটী বাক্স বাহির করিয়া তাহা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইল। তাহার পর উহাতে ভোজনপাত্র ও খাদ্যদ্রব্য সকল সাজাইতে সাজাইতে সে প্রফুল্লমুখে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ডাঃ বসুর জন্যে খানকতক স্যাণ্ডউইচ্ (sandwitch) তৈয়ারী করে নেব কি?"

মাতা বলিলেন, "নিয়ো।'

সুকুমারী উৎসাহের সহিত আবার বলিল, "আর কিছু মিষ্টান্ন

নেব। আর ডাঃ বসু মিষ্টি খেতে ভালবাসেন না, তাঁর জন্যে খানকতক লুচি ভেজে নিতে হবে।"

মাতা ভাবিলেন, মেয়ে আমার কেবল ভাবছে ডাঃ বসু, ডাঃ বসু! তিনি হাসিয়া বলিলেন, "শুধু ডাঃ বসুর জন্যে নয়, আমাদের জন্যেও খানকতক নিয়ো।"

সুকুমারী মাতার হাসির কারণটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আবার ডাঃ বসুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল; সে কহিল, "আর শুধু আলুর দম না নিয়ে খানকতক বেগুন ভাজাও নিতে হবে; ডাঃ বসু বেগুন ভাজা খেতে বড্ড ভালবাসেন।"

বিধবা কন্যার সেই অত্যধিক প্রফুল্লতা দেখিয়া মাতা মনে করিলেন যে, মৃত স্বামীর স্মৃতি তাহার মন হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। ডাঃ বসুর জন্য খাদ্য সংগ্রহে তাহার সেই উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া মাতা সহজেই মনে করিলেন যে, সুকুমারী সত্যই ডাঃ বসুর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিণী হইয়াছে;—অত্যন্ত অনুরাগের সঞ্চার না হইলে, কেহ স্যাণ্ডউইচ, লুচি বা বেগুন ভাজার জন্য তত ব্যগ্র হইত না। কন্যার এই অনুরাগ লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া মাতা মনে মনে অতিশয় প্রীতা হইলেন। ভাবিলেন, কন্যা আবার নূতন সংসার পাতিয়া, দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিয়া সফল জীবন যাপন করিতে পারিবে। ভাবিলেন, দৈবক্রমে যদি তাঁহারা ওয়ালটায়ারে না আসিতেন, তাহা হইলে ডঃ বসুর সহিত তাঁহাদের কখনই সাক্ষাৎ ঘটিত না; এবং কন্যার বৈধব্যদুঃখ এত শীঘ্র নিবারিত হইত না। তিনি মনে মনে বিধবাদের দুঃখ-

হারী পরব্রহ্মকে প্রণাম করিলেন! ভাবিলেন ভগবানের রাজ্যে সুবিচার আছে বলিয়াই কত কাল পরে দুঃখিনী বিধবা বঙ্গললনা-গণ আবার পতিলাভ করিতে পারিতেছে; ধরণীর আধুনিক মুখে সভ্যা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইতেছে।

মাতা যাহাই ভাবুন, আমরা জানি, সুকুমারীর মনোমধ্যে বিধবাবিবাহের এতটুকু ইচ্ছাও উদিত হয় নাই; অথবা ডাঃ বসুর প্রতি কোনও অনুরাগই তাহার হৃদয়মধ্যে স্থানলাভ করে নাই। প্রাকৃতিক প্রফুল্লতা এবং একজন বন্ধু অতিথিকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষই তাহাকে প্রফুল্লা ও উৎসাহান্বিতা করিয়াছিল। প্রেমের খেলায় মানুষকে, বিশেষতঃ স্ত্রী জাতিকে, কখনও প্রফুল্ল করে কিনা, সে বিষয়ে আমাদের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, প্রেমলীলায় প্রেমিকাগণকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণা করিয়া রাখে; মুহুর্মুহু অভিমানে, কথায় কথায় অবিশ্বাসে, চির-বিচ্ছেদ ভয়ে তাহারা কখনই প্রফুল্ল হইবার অবসর পায় না। আমরা বৃদ্ধ মানুষ, আমাদের মনে হয়, ভালবাসাটা যুবক যুবতী-গণের হৃদয়ের একটা পীড়া; ইহাতে প্রেমপীড়িতকে সর্ব্বদা ব্যথিত করিয়া রাখে। প্রবীণা মাতা নবীন প্রেমতত্ত্বের এই ইতিহাস-টুকু ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাই বিস্মৃতির অস্পষ্ট আলোকে কন্যার প্রফুল্লতায় প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়াছিলেন।

যে বিচিত্র নৈসর্গিক প্রফুল্লতা সুকুমারীর সুকুমার হৃদয়মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার দ্বারা ডাঃ বসুও সহজেই প্রতারিত হইয়াছিলেন। প্রাতরাশ জন্য তিনি সুকুমারীর সম্মু-

খের আসনে উপবেশন করিয়া, তাহার মুখে ও চক্ষে অসম্বরণীয় প্রফুল্লতা লক্ষ্য করিলেন। স্ত্রীজাতির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া, এবং প্রেমমন্ত্রের প্রভাববিহীন হৃদয় লইয়া, তিনি বুঝিলেন যে, সম্ভ নূতন স্বামী লাভ করিবার প্রত্যাশায় এই স্বার্থপরা নারকীয়া নারী প্রফুল্লা হইয়া উঠিয়াছে। কি ঘৃণা! কি ঘৃণ্য লজ্জাদায়িকা লজ্জা! নারীপূজাযজ্ঞ ফেনলেহনকারী যে অসার পুরুষ সারমেয়গণ এই মহা অপদার্থদিগকে অপার্থিব রত্ন মনে করিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করে, আর মনে করে যে সুখসাগরের তরঙ্গে ভাসিতেছি, তিনি মনে মনে তাহাদিগকে শত শতবার ধিক্কার করিলেন। সুকুমারীর প্রফুল্ল কটাক্ষপাত, প্রফুল্ল ভাষণ এবং প্রফুল্ল অঙ্গ ভঙ্গিমা লক্ষ্য করিয়া, কামিনীগণের প্রতি তাহার স্বাভাবিক বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি আপন মনোভাব গোপন রাখিয়া, রহস্যালাপে ও কৌতুক কথায় সুকুমারীর সেই প্রফুল্লতা অক্ষুন্ন রাখিলেন।

অতঃপর আহারাদি সমাধা করিয়া, বেলা নয়টার কিছু পূর্ব্বে সিংহাচলে যাইবার জন্য সকলে মিলিয়া মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। গাড়ী চালাইবার জন্য সফার আসে নাই; ডাঃ বসু স্থির করিয়াছিলেন যে নিজেই গাড়ী চালাইবেন। গাড়ীর ভিতরে আসনে মিঃ অরুণোদয় দত্ত সস্ত্রীক উপবেশন করিলেন; বৃদ্ধ বেহারা দুইটি টিফিন বাস্কেট লইয়া তাঁহাদের সম্মুখের আসনে বসিল। গাড়ীর ভিতরে মাতাপিতা যে আসনে বসিয়াছিলেন, তাহাতে আর একজনের বসিবার যথেষ্ট স্থান ছিল; সুকুমারী

তাহাতে অনায়াসে উপবেশন করিতে পারিত ; কিন্তু সে সেখানে বসিল না ; শীঘ্র অগ্রসর হইয়া আগ্রহের সহিত মোটর চালকের পার্শ্বের আসনে উপবেশন করিল। প্রকৃত পক্ষে তাহার যৌবন-যুক্ত দীপ্ত দেহ বাহিরের মুক্ত মারুতের স্নিগ্ধতা উপভোগ করিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়াছিল। কিন্তু ডাঃ বসু ও তাহার মাতাপিতা সকলেই ভাবিলেন যে, ভাবী পতির সান্নিধ্য সুখলাভ করিবার জন্যই সে তাহার পার্শ্বের আসন গ্রহণ করিল। ইহাতে ডাঃ বসু প্রীত হইলেন ; ভাবিলেন, তাহার দুষ্ট সংকল্পটা সিদ্ধির পথে আরও একটু অগ্রসর হইল। ইহাতে মাতাপিতাও প্রীত হইলেন ; ভাবিলেন, কন্যা আবার পতিসোহাগিনী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিবে।

প্রায় তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, বাঁশী বাজাইয়া, ধুলি উড়াইয়া, সুকুমারীর অলকগুচ্ছ ও অবগুণ্ঠন স্থানচ্যুত করিয়া, বেলা নয়টার কিছু পরেই মোটর গাড়ী সিংহাচল পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।—শিশু যেন ছুটিয়া আসিয়া মাতৃবক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পর্ব্বতপৃষ্ঠে এক অধিত্যকার উপর দেবায়তন স্থাপিত ছিল। পর্ব্বতমূল হইতে অষ্টোত্তর সহস্র অধিরোহণী অধিরোহণ করিয়া ঐ অধিত্যকায় উঠিতে হইবে। ঐ অধিত্যকার উপর নৃসিংহ দেবের সুগঠিত মন্দির, ধ্বজস্তম্ভ, মুখমণ্ডপম্, গর্ভগৃহ ও কল্যাণম্ স্থাপিত ছিল। এই দেবালয় কোন্ কালে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা ঔপন্যাসিক, তাহার সংবাদ রাখিনা ; এ প্রশ্নের উত্তর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ দিতে পারিবেন। কিন্তু দেবালয়টি যে অত্যন্ত

প্রাচীন, তাহা উহার শিল্পকলা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কথিত আছে, পরিব্রাজক অবস্থায় চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে এই দেবালয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, বঙ্গাব্দ দশম শকাব্দার প্রথম ভাগে ঐ মন্দির বর্ত্তমান ছিল; কারণ চৈতন্যদেব ৮৯২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে কালে দাক্ষিণাশ্রম পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। দেবালয়ের পুরোহিতগণ কহিয়া থাকেন যে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভগবদ্‌ভক্ত পুত্র প্রহ্লাদ এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘোর কলিকালে সত্যযুগের প্রহ্লাদের কথার দরকার কি? তাহার চেয়ে বিধবার বিবাহ প্রসঙ্গ ঢের শ্রুতিসুখকর হইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্মোহিতা।

একটি বৃক্ষছায়া-শীতল নিভৃত স্থানে মোটর গাড়ীখানি রাখা হইল। গাড়ীর অন্তরালে একখানি সতরঞ্চ বিস্তৃত করা হইল। গাড়ীর ভিতর হইতে টিফিন বাক্স দুইটি বাহির করিয়া, বিছানার মধ্যভাগে উহা এমন ভাবে রক্ষিত হইল যে সে দুইটির উপর একটি ভাঁজ করা টেবিল ক্লথ বিছাইয়া, তাহার উপর ভোজন-পাত্র রাখিয়া, তাহার চারিদিকে চারিজন বসিয়া অনায়াসে আহার করিতে পারেন। টিফিন বাস্কেটের ও গাড়ী রক্ষার ভার বৃদ্ধ বেহারার উপর অর্পণ করিয়া সকলে পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুকুমারী যৌবনসুলভ লঘু পদক্ষেপে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া ডাঃ পি, কে, বসুর সহিত উপরে উঠিতে লাগিল। তাহার সৌম্য অবয়বের আন্দোলনে যেন আনন্দ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার প্রীতিপূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি আনন্দতরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মত ডাঃ বসুর চক্ষে প্রতিহত হইতে লাগিল। তাহার সম্মোহন বাক্যসকল পিয়ানোর ঝঙ্কারের ন্যায় ডাঃ বসুর কর্ণে ধ্বনিত হইল। ঊর্দ্ধো-খানের শ্রমজনিত তাহার সঘন নিশ্বাসে পুষ্পপরিমল প্রবাহিত হইল। কিন্তু কিছুতেই ডাঃ বসুর মন মজিল না; তিনি মনে করিলেন, উহা প্রেমপ্রেতিনীদের প্রতারণাজাল মাত্র।

যুবকযুবতীর পশ্চাতে মিঃ অরুণোদয় দত্ত স্ত্রীকে লইয়া বয়সোচিত পদবিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণী অধিরোহণ করিলেন। ক্রমে মিঃ দত্তের বাতব্যাধিব্যথিত অবসন্ন পদদ্বয় আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। তখন তিনি একটি সোপানের উপর উপবেশন করিয়া একটা পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং পত্নীকে কহিলেন, "দেখ দেখ, ঐ নীচেকার ঐ গাছগুলা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!—যেন সবুজরঙের সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে।"

মিসেস্ দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কি আরও উপরে উঠতে পারবো না?"

মিঃ দত্ত তাঁহার ক্লান্ত জানুদ্বয়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আরও উপরে ওঠবার দরকার কি? তার চেয়ে, এস, এইখানে আমার কাছে বসে, চারিদিকে স্বভাবের চমৎকার শোভা দেখ। আর যুবকযুবতীদিগকে এই আনন্দভ্রমণটা নির্জ্জনে উপভোগ করতে দাও। তাদের নীচে নাম্‌তে দেখলে, আমরা আগেই নেমে যাব; আর ষ্টোভ জ্বেলে টিফিনটা গরম করবার চেষ্টা করবো।"

মিসেস্ দত্তও প্রবীণ দেহের গুরুভারে ভারাক্রান্তা হইয়াছিলেন। তিনি সহজেই স্বামীর সদুপদেশ গ্রহণ করিলেন; তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আপন চক্ষে নিরীক্ষণ না করিলে. কেবল আমাদের বর্ণনাপাঠে

তোমরা সেই দৃশ্যের অদ্ভুত মনোহারিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না। একদিকে বৃক্ষাদি শূন্য, উচ্চ, নীরস-পাষাণময় শৈল, বিরাট দেবমূর্ত্তির ন্যায়, নীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে নীরবে দাঁড়াইয়াছিল; অন্যদিকে নিম্নে শ্যামা সৌম্যা প্রকৃতি যেন রৌদ্ররাগরঞ্জিত ক্ষৌম-বস্ত্র পরিধান করিয়া দেবতার পাদবন্দনায় নিযুক্তা ছিলেন, পার্শ্বে একটি ক্ষীণাকায়া নির্ঝরিণী হইতে যেন ভক্তির অনবস্থ ধারা বিগলিত হইয়া পড়িতেছিল। অধিরোহণী-শ্রেণীর উর্দ্ধসীমায় নৃসিংহদেবের সুন্দর দেবায়তন প্রভাত তপনালোকে কনকবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; উষর-অচলাঙ্গ ধূসর-মাতঙ্গপৃষ্ঠের ন্যায় অনুমিত হইতেছিল। তাহার উপর দিবাকর করোজ্জ্বল ঐ দেবপীঠ, কুঞ্জর-পৃষ্ঠে সিংহবাহিনীর বিশাল স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত মন্দিরচূড়া দেবীর মস্তকের মণিমুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তরুণী আপনার নবোদ্গত পৃথুল বক্ষঃশোভা দেখিয়া যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, ধরাধর বক্ষ দেখিয়া ধরণীও বুঝি তেমনই প্রফুল্লা হন। পর্ব্বতময়ী পৃথিবীর উপর আকাশ অইতে সূর্য্যদেব প্রফুল্ল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে-ছিলেন। তোমরা প্রেমপূর্ণ নয়নে তোমাদের নবোঢ়াগণকে যেমন দেখ, দেব দিবাকরও তেমনই প্রেম-পূর্ণ চক্ষে সাগরাম্বরা ভূধর-পয়োধরা ধরণীকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সেই প্রেমময় দেবদৃষ্টির তলে সামান্য লতাগুল্ম, ক্ষীণা নির্ঝরিণী, ক্ষুদ্র কঙ্করকণা যেন দেবী বসুমতীর রত্নালঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। আহা! তেমন কি আর কখনও দেখিব?

সেই মনোমুগ্ধকর সুখময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সুকুমারী ডাঃ বসুর সহিত অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। এখন সে পদদ্বয়কে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিবার জন্য প্রস্তরসোপানের উপর ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইল; পর পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে তাহার মাতাপিতা তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন না। সে মনে করিল, তাঁহারা তাহাদের মত দ্রুত সোপান আরোহণ করিতে পারেন নাই। সেই স্থানে তাঁহাদের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তাঁহারা ক্রমে তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন। সে ডাঃ বসুকে কহিল, "মা বাবা অনেক পেছিয়ে পড়েছেন; আমরা এইখানে একটুখানি অপেক্ষা করে, তাঁরা এলে, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আবার উপরে উঠবো।"

ডাঃ বসু সুকুমারীর দিকে এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যেন পূর্ণপ্রেমে তাহা বিগলিত হইয়া গিয়াছে, যেন প্রেমমধুতে সে দৃষ্টি মিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পর, কণ্ঠে ভালবাসার মধু সিঞ্চিত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, "কেন, সুকুমারী, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার কি? একলা আমার সঙ্গে যেতে কি তোমার সাহস হয় না?"

ডাঃ বসুর প্রেমললিত লোচন দেখিয়া, তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রেমের সুর লক্ষ্য করিয়া দারুণ লজ্জায় সুকুমারীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার দৃষ্টি আনত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কষ্টে আপনাকে সম্বৃত করিয়া অবনত মুখে কহিল, "আপনার সঙ্গে

আমি একাই যেতে পারি, কিন্তু তাঁদের ফেলে গেলে, তাঁরা কি মনে করবেন ?"

ডাঃ বসু আবার প্রেম-গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, "কি মনে করবেন, বল দেখি সুকুমারী।"

সুকুমারী এ কথার কি উত্তর দিবে ? সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হৃদয়মধ্যে একটা ঘাত প্রতিঘাত উত্থিত হইল।

ডাঃ বসু হাসিয়া বলিলেন, "কি মনে করবেন, জান ? মনে করবেন যে, দুইটি বসন্তের কোকিল কোনও নিভৃতের কোণে বসে কুহুধ্বনি করছে।"

সুকুমারী এই কুহুধ্বনির অর্থ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল ; এবং তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে ডাঃ বসুর দিকে নেত্রপাত করিতে সাহস করে নাই। তথাপি সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আনত মুখে কহিল, "কুহুধ্বনি ?"

ডাঃ বসু আগ্রহের সহিত কহিলেন, "হাঁ, কুহুধ্বনি ! প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমালাপকে প্রবীণেরা কুহুধ্বনি বলে থাকেন। তাঁরা ভাবছেন যে, এই নীরস পাহাড়ের পথে সরস প্রেমের কথা বেশ চলতে পারে।"

সুকুমারী লজ্জাবিজড়িত চক্ষে ভয়ে ভয়ে ডাঃ বসুর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার চক্ষের সহিত ডাঃ বসুর অত্যন্ত আগ্রহময় চক্ষু মিলিত হইল। সুকুমারী দেখিল ডাঃ বসুর বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু দিয়া অপ্রমেয় প্রেম উছলিয়া পড়িতেছে। সেই প্রেমপূর্ণ

দৃষ্টির প্রভাবে, তাহার শিরায় শিরায় তড়িৎ প্রবাহ প্রবাহিত হইল। একবার সে আত্মহারা হইয়া পড়িল; একবার মৃত-স্বামীর পুণ্যস্মৃতি এই নূতন প্রবাহের প্রবলতায় ভাসিয়া গেল।

সেই শুভ সুযোগে ডাঃ বসু তাহার মুগ্ধকর্ণের নিকট মুখ আনিয়া আগ্রহময় প্রেম কথায় তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি প্রেম-সরস কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"শোন সুকুমারী, আমি তোমাকে ভালবাসি; কত ভালবাসি তা কেমন করে বলবো? ভাষায় ত তেমন কথা নাই। সে ভালবাসার কথা বলতে গেলে একটা জীবনে শেষ হবে না। তুমি আমার এই মুখের দিকে চেয়ে বুঝে দেখ তোমাকে কত ভালবাসি। বল সুকুমারী, তুমি আমার হবে? আমার হয়ে তোমার মনের কোণে একটু স্থান দেবে? কাল বিকালে তোমার বাবার অনুমতি পেয়েছি। তুমি আমাকে বিয়ে করে আমার জীবন সার্থক কর। চল, সুকুমারী, আমার গৃহিণীহীন গৃহে সর্ব্বময়ী হয়ে থাকবে। কথা কও, সুকুমারী কথা কও। আমার পিপাসিত কাণের কাছে একটি কথা কয়ে বল যে, তুমিও আমাকে ভালবাস। বল, যে তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।"

ডাঃ বসুর প্রণয়াভিনয়ে বেচারা সুকুমারী সম্পূর্ণ প্রতারিত হইয়াছিল। সেই আগ্রহময় প্রেম-সম্ভাষণে আত্মহারা সুকুমারীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে প্রেমপ্রফুল্ল চক্ষে ডাঃ বসুকে দেখিল। প্রেমের রঙ্গীন চশমাপরা সেই চোখে ডাঃ বসুর বলিষ্ঠ ও সুগঠিত

অবয়ব আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। তাঁহার অনিন্দ্য মুখমণ্ডল যেন মদস্রাব করিল; সুকুমারীর নেত্রদ্বয় তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় যে তীক্ষ্ণ প্রণয়রশ্মি উদ্গীরণ করিল, তাহাতে সুকুমারীর সমস্ত অন্তরতল সুখালোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই তীক্ষ্ণ আলোকে তাহার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। সম্মোহিতা ধীরে ধীরে কহিল, "আপনি যদি আমাকে গ্রহণ করেন, আমি আপনাকে সুখী করতে চেষ্টা করব।"

ডাঃ বসু পূর্ব্ববৎ আগ্রহময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাস, সুকুমারী?"

অগ্নিতাপে ঘৃত যেমন গলিয়া যায়, নির্জ্জন স্থানে সুন্দর পুরুষের মুখে প্রেমের আহ্বান শুনিয়া সুকুমারীর মনটা তেমনই গলিয়া গিয়াছিল। সে অর্দ্ধনীমিলিত নেত্রে অস্পষ্ট স্বরে কহিল—"বাসি।"

শুনিয়া ডাঃ বসুর অন্তরমধ্যে হাসির যে তরঙ্গ উঠিল, তাহার খল্ খল্ উচ্চরোল যদি অন্তরের বাহিরে আসিতে পারিত, তাহা হইলে, তাহা নিশ্চয় কড় কড় বজ্রনিনাদকে নিন্দিত করিত; কিন্তু তিনি সে উচ্চহাসি অন্তরমধ্যে দমন করিয়া, সুকুমারীর মুগ্ধ কর্ণে আরও প্রণয়কথা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুর পত্র ও বিবাহের শুভদিন।

কলিকাতা হইতে অন্য কোনও স্থানে যাইতে হইলে, বা অন্য স্থান হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, হাওড়া বা শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিতেই হইবে, ইহা মনে করিয়া, মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত শ্বশুর ও পত্নীর সন্ধানে প্রত্যহ হাওড়া ষ্টেশনে যাইতে লাগিলেন। দারজিলিং হইতে ফিরিয়া অবধি মিঃ গুপ্তের ইহা নিত্যকর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তৎ তৎ স্থানে কত রকম লোক কত দেশ বিদেশে যাত্রা করিত, কত রকম লোক কত দেশ বিদেশ হইতে আগমন করিত; মিঃ গুপ্ত কখন নীরবে বেঞ্চের উপর বসিয়া, কখন ধীরে পাদচালনা করিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন কিন্তু সেই অসংখ্য রেলযাত্রীদিগের মধ্যে কেহই শ্বশুর বা শ্বশুর-নন্দিনীরূপে দেখা দিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতেন না। অপাঙ্গে তাঁহার আগ্রহময় আকুল দৃষ্টি দেখিয়া, কোনও অবগুণ্ঠনবতী ঈষৎ অবগুণ্ঠন তুলিয়া ভ্রূকুটী করিত, কোনও পদ্মপলাশাক্ষী কটাক্ষ বিনিময় করিত, কোনও বিম্বাধরা অধরভঙ্গী করিয়া হাসিত; কিন্তু তিনি কখনই সুকুমারীর পরিচিত মুখ দেখিতে পাইতেন না। তিনি ষ্টেশনের কর্ম্মচারীগণকে, রক্ষকগণকে, কুলিগণকে প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু কেহই সুকুমারী বা তাহার পিতার

সন্ধান দিতে পারিত না। তিনি পুস্তকের দোকানে, টিকিটঘরে ও ভোজনাগারে প্রত্যহ অনুসন্ধান করিতেন, কিন্তু কোনও স্থানে তাঁহাদিগের সন্ধান পাইতেন না। শেষগাড়ী দেখিয়া, তিনি প্রত্যহ নিরাশ হৃদয়ে হোটেলে ফেরত আসিতেন; এবং কখনও দুঃস্বপ্ন নিদ্রায়, কখন অনিদ্রায় রাত্র অতিবাহিত করিতেন। এই প্রকার জীবন যাপন ক্রমে তাঁহার পক্ষে অসহ হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর তিনি কি করিবেন, তাহা সহসা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণটা যেন কোথায় সুকুমারী, কোথায় সুকুমারী বলিয়া দিগ্বিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অবশেষে, প্রায় এক মাস কাল কলিকাতায় অবস্থিতির পর, বৃথা অন্বেষণে বিফল হইয়া, মিঃ গুপ্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে বন্ধু ডাঃ পি. কে. বসুকে পত্র লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

"দি প্যালেস্ হোটেল, কলিকাতা।
"—ডিসেম্বর, ১৯—।

প্রিয় প্রাণকান্ত—

অনেক দিন তোমার কোনও খবর পাই নাই, আমিও আমার খবরটা তোমাকে জানাই নাই। তাই আজ পত্র লিখিতে বসিলাম। তোমাকে আমি শেষ পত্র কোথা হইতে লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরগুলিতে অনুসন্ধান করিয়া, আমি দারজিলিঙে গিয়াছিলাম। সেখানে তাঁহাদের সংবাদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু সাক্ষাৎ পাই

নাই। আমি দারজিলিংএ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা দারজিলিং ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাযেই আমার সুকুমারীকে আমি দেখিতে পাই নাই; এবং কোনও উপায়ে তাহাকে জানাইতে পারি নাই যে আমি জীবিত আছি। দারজিলিংএর ষ্টেশনে সংবাদ লইয়া জানিলাম যে তাহারা শিয়ালদার টিকিট ক্রয় করিয়া দারজিলিং হইতে নামিয়াছেন। কিন্তু আমি কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিলাম, যে তাঁহারা কলিকাতাতে অবস্থিতি করিতেছেন না; কলিকাতাতে কেহই তাঁহাদিগকে দেখেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা শিয়ালদাতে নামিয়া, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন তাহা কেহই বলিতে পারে না।

একটা কথা আমি তোমাকে গর্ব্বের সহিত জানাইব। সুকুমারী যদিও এখনও জানিতে পারে নাই সে বিধবা নয়, তথাপি সে বিধবা বিবাহের কোনও উদ্যোগই করে নাই। আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, এখনও সে তাহার পিতার সহিত বাস করিয়া বৈধব্য দশা উপভোগ করিতেছে; তুমি নিশ্চয় জানিও সে আর কখনও পত্যন্তর গ্রহণ করিবে না—আমার শেষাজ্ঞা পালন জন্যও নহে। যতকাল সে আবার আমার সাক্ষাৎ না পাইবে ততকাল সে বৈধব্যের অসহ্য দুঃখ স্মিত মুখে সহ্য করিবে; এবং আমারই স্মৃতিতে তাহার বক্ষঃ পূর্ণ করিয়া রাখিবে? ধন্য এই স্ত্রীজাতি! তুমি পাষাণ হৃদয় লইয়া ইহাদের মহিমা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না।

তুমি কেমন আছ? আমার কথা জিজ্ঞাসা করিও না। যে জীবন তোমার কৃপায় বাঁচিয়াছে, তাহা ক্রমে তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। এ জীবন্ত মুখ এখনও কোন বন্ধু বান্ধবকে দেখাইতে সাহস করি নাই। কি জানি হয়ত তাঁহারা আমাকে প্রেত মনে করিবেন। আমার শ্বশুর মহাশয়ের এক বন্ধু সত্যই আমাকে প্রেত মনে করিয়াছিলেন। আমিও ক্রমে আপনাকে প্রেত মনে করিতেছি।

উপরে আমার ঠিকানা দেখ। যতদিন কলিকাতায় থাকিব ততদিন ঐ ঠিকানাতেই বাস করিব। ঐ ঠিকানাতেই তুমি আমাকে পত্র লিখিও।

একান্ত তোমারই
নীরদবরণ।'

সিংহাচল হইতে বসন্ত কুটীরে এবং তৎপরে বসন্তকুটীর হইতে আপন বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া ডাঃ বসু বন্ধুর ঐ করুণরসাত্মক পত্র খানি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পত্র পাইয়া এবং তাহা পাঠ করিয়া, তাঁহার বদ্ধ হাসির বাধা একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর তিনি কি গগনভেদী অট্টহাসির উচ্চ রোল উত্থিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ।

কিন্তু তিনি তখনই ঐ পত্রের উত্তর দিতে বসিলেন না। ভাবিলেন, আগে শুভবিবাহের দিনটা এবং অন্যান্য সকল

আয়োজন যথাবিধি ঠিক হইয়া যাক, তাহার পর বন্ধুকে ওয়ালটেয়ারে আনিয়া, অন্যকে বিবাহ করিবার জন্য পরিণয়-বেশধারিণী পত্নীকে তাহার পুরাতন হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

অতএব পরদিন ডাঃ বসু বসন্ত কুটীরে যাইয়া মিঃ অরুণোদয় দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং বিবাহের একটা শুভদিন স্থির করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

মিঃ দত্ত পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন,—"কলকাতায় গিয়ে ধুমধাম করে বিয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সুকুও বোধ হয় সেটা পছন্দ করবে না। বিয়ে এই ওয়ালটেয়ারেই দেওয়া হবে। কিন্তু ধুমধাম না হোক, এখানেও সামান্য রকম একটু আয়োজনের দরকার হ'বে। বিয়েটা আনন্দোৎসব; এতে সামান্য একটু আমোদ আহ্লাদের যোগাড় করতে না পারলে, ভাল দেখাবে না। জন কতক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। তাঁদের আহারের জন্যে কলকাতা থেকে ভাল আহারের সামগ্রী, রাঁধবার জন্যে ভাল বাবুর্চি আনতে হবে। এ ছাড়া নিমন্ত্রণের কার্ডগুলোও কলকাতা থেকে ছাপিয়ে আনতে হবে। আমার পূর্ব্ব জামাতার পীড়ার চিকিৎসার জন্যে সুকু তার গায়ের সকল গহনাই বিক্রি করে ফেলেছিল। এখন কিছু নূতন অলঙ্কার তৈয়ারী করা দরকার। এ সব ব্যাপারে কিছু সময় লাগবে। আমার

মনে হয়, আগামী বছরে পয়লা জানুয়ারী বিয়ের দিন স্থির করলে সকল দিকে সুবিধা হবে।"

সে আর দশদিন! তাহাতে ডাঃ বসুর আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না। তিনি সম্মত হইয়া বাটী ফিরিলেন। আমরা জানি, বাটী ফিরিবার সময় তিনি সুকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান নাই।

বাটী ফিরিয়াই তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন; এবং সেখান হইতে পরিণয় উপহার জন্য বস্ত্রালঙ্কার ও নূতন গৃহ-সজ্জা ক্রয় করিয়া দুই তিন দিন পরে বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর তিনি কয়েক দিন ধরিয়া আপন আবাসবাটী বিবাহোৎসবের উপযোগী করিয়া পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিলেন। ভাবী পত্নীর ব্যবহারের জন্য কয়েকটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহা মনোজ্ঞ দৃশ্যচিত্রে, বৃহৎ দর্পণে, উজ্জ্বল স্ফটিক নির্ম্মিত পুষ্পাধারে, সুদৃশ্য আলোকাধারে ও বিচিত্র যবনিকায় সজ্জিত করিলেন। স্ত্রীজনোচিত মূল্যবান দারুময় গৃহসজ্জা সকল যথা-যথ স্থানে সংস্থাপিত করিয়া কক্ষশ্রী বর্দ্ধিত করিলেন। এই গৃহসজ্জা দেখিয়া ডাঃ বসুর বন্ধু বান্ধবগণ মনে করিলেন যে, নবপরীণীতা পত্নীকে গৃহে আনিবার উদ্যোগ হইতেছে। তিনি নিজে বুঝিলেন যে, রহস্যাভিনয়ান্তে যদি বন্ধু নীরদবরণ পত্নীসহ কিছুদিন তাহার বাটীতে বাস করেন, তবে তাহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না

বলা বাহুল্য যে ডাঃ বসু আপন বাটী সজ্জিত করিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, কলিকাতা হইতে ফিরিয়া দুই তিন দিন সুকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর পান নাই। তিনি নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আহ্লাদে এত মত্ত হইয়াছিলেন যে, সুকুমারীর সহিত এই দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ না করাটা যে তাঁহার প্রণয়াভিনয়ে মস্ত একটা গলদ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কুমারী প্রাণতোষিণী।

কয়েকদিন পরে আজ ডাঃ পি, কে, বসু বসন্তকুটীরে সুকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কলিকাতাতে পরিণয় উপহার জন্য যে অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পকেটে ছিল; তিনি উহা সুকুমারীকে দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

ড্রইংরুমে ঢুকিয়া তিনি ডাকিলেন, "সুকুমারী?"

তিনি যাহাকে সুকুমারী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, সে দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট বসিয়া ছিল; ডাঃ বসু তাহার মুখ দেখিতে পান নাই। এক্ষণে সে ডাঃ বসুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফিরিয়া বসিল; এবং মৃদু হাসিয়া, কতকটা ব্যঙ্গ বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "আমি আপনার সুকুমারী নই;— আমাতে—দেখছেন ত—কিছু মাত্র 'সু' নেই। আমি কেবলমাত্র কুমারী প্রাণতোষিণী।"

ডাঃ বসু চাহিয়া দেখিলেন, সত্য প্রাণতোষিণীই বটে। তিনি এত রূপ আর কখনও দেখেন নাই। বিধাতা যেন সহস্র সহস্র কুসুমের সুষমা সংগ্রহ করিয়া সে মধুর মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন। তাহাতে যেন বিশ্বের সমস্ত সৌরভ ও কোমলতা একত্র করা হইয়াছিল; তাহাতে যেন ভগবান বিষ্ণু মোহিনী

বেশে সুধাভাণ্ড লইয়া দেবতাদিগের বাঞ্ছিত সমুদয় সুধাটুকু ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া ডাঃ বসুর সহসা বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; মুগ্ধনেত্রে নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রাণতোষিণী কে? ডাক্তার বসুকে নির্ব্বাক রাখিয়া আমরা তাহার সম্বন্ধে দুটা কথা বলিব। আমরা ইতিপূর্ব্বে মিঃ রুদ্রকান্ত বানার্জি নামক এক ধনী সন্তানের কথা বলিয়াছি। প্রাণতোষিণী তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী। এই প্রাণতোষিণীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্যই তিনি পূর্ব্বে একবার তাহার অভিন্নহৃদয় সখী সুকুমারীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন; দৈবক্রমে সে বিবাহ ঘটে নাই। প্রাণতোষিণী দ্বাবিংশবর্ষীয়া যুবতী; কিন্তু এ যাবৎ বিবাহ করে নাই; পুরুষজাতির মধ্যে একটা লোককেও সে বিবাহের যোগ্য মনে করিতে পারে নাই। সেরূপ স্বাধীনমতাবলম্বিনী স্ত্রীকে লইয়া সংসার করা চলিবে না মনে করিয়া, অনেক সংসারাভিজ্ঞ পুরুষই তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু যে সকল ভদ্রব্যক্তি রূপ ঐশ্বর্য্য ও গুণের গৌরব লইয়া, তাহার নিকট আসিয়া অতি বিনীত ভাবে বিবাহের প্রস্তাব করিতে সাহস করিত, সে হেলায় তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিত; ভাবিত, যে মহোৎপল গ্রহপতিকে প্রার্থনা করে, তাহার নিকট সামান্য মৌমাছিগুলা আসিয়া কেন ভন্ ভন্ করে।

ডাঃ বসুকে মৌন ও বিহ্বলনেত্র দেখিয়া প্রাণতোষিণী সস্মিত

মুখে আবার কহিল, "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনি ডাক্তার প্রাণকান্ত বসু। আপনিই নাকি আমার বাল্যসখী সুকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন। আপনি একটু বসুন। সুকুমারী অন্য ঘরে আছে; এখনই আসবে।"

প্রাণতোষিণীর কথা শুনিয়া ডাঃ বসুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। বিহ্বলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "আপনি? কই, আপনাকে ত আগে কখনও এখানে দেখিনি?" এই বলিয়া তিনি প্রাণতোষিণীর নিকটবর্ত্তী একটা আসন গ্রহণ করিলেন।

তাঁহাকে নিকটে বসিতে দেখিয়া হঠাৎ প্রাণতোষিণীর দৃষ্টি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার মনের ভিতরেও কি একটা গোল-মালের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সে ধমক দিয়া মনকে শাসিত করিল; এবং তাড়াতাড়ি ডাঃ বসুর প্রশ্নের উত্তর দিল, "কেমন করে দেখবেন? আমিও আগে কখনও এখানে আসিনি; আর, আপনিও কলকাতায় গিয়ে আমাকে কখনও দেখবার চেষ্টা করেন নি।'

ডাঃ বসু। আপনি বোধ হয় কলকাতা থেকে এসেছেন?

প্রাণ। 'বোধহয়' নয়; নিশ্চয় কলকাতা থেকে এসেছি; এবং নিশ্চয় কলকাতা ফিরে যাব।"

সাবধান, প্রাণতোষিণী! ভবিষ্যতের উপর অতটা আস্থা স্থাপন করিও না। কলিকাতা হইতে আসিয়াছ এটা নিশ্চয় বটে, কিন্তু সেখানে নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে, একথা তুমি দর্পের সহিত বলিতে

পার না। জানিও, তোমার মাথার উপর একজন দর্পহারী আছেন।

প্রাণতোষিণী বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি কেন এসেছি জানেন? সুকুমারী মহা বিপদে পড়ে আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখেছিল, আমি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

ডাঃ বসু। সুকুমারীর কোনও বিপদের কথা ত আমি শুনিনি। তবে আমি ক'দিন বসন্ত কুটীরে আসিনি, এর মধ্যে যদি কোনও বিপদ ঘটে থাকে। তার কি হয়েছে?

প্রাণ। আপনিই তাকে বিপদে ফেলেছেন।

ডাঃ বসু। আমি?

প্রাণ। আপ'ন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

ডাঃ বসু। তা ত চেয়েছি।

প্রাণ। আমার মতে, মেয়েমানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় আর কিছু বিপদ হতে পারে না। আপনারা দয়া করে যতদিন আমা'দের সুখের পথে কণ্টক হয়ে না দাঁড়ান, ততদিন আমাদের জীবনটা বড় সুখে কেটে যায়। আপনারা অনেক রকম মিথ্যে কথা বলে, হাতে সপ্ত স্বর্গ তুলে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে, আমাদিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান; তারপর চুলের মুটি ধরে বাড়ীর চাকরাণীর ও রাঁধুনীর কাযে লাগিয়ে দেন। বিয়ের আগে যে হাতে ভাল ভাল ফুলের তোড়া উপহার দেন, বিয়ের পরে সেই হাতেই ঝাঁটা আর হাতা বেড়ী না দেখলে, চক্ষু একে-

বারে রক্তবর্ণ করেন। আমি শুধু ভাবি, আপনাদের মত কর্কশ ও স্বার্থপর জাতটাকে, বুদ্ধিমতী হ'য়েও সত্যই কোন কোন মেয়েমানুষ কেন ভালবেসে ফেলে!—ছি ছি! মিসামাখা দাঁতবুরুসের মত ঐ গোঁফ! শূন্য কলসীর তলদেশের মত ঐ মাথা! গাছের ডালের মত ঐ লম্বা লম্বা হাত পা!—এতে কি আছে, যে আমাদের জাতটা ঐ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে?

ডাঃ বসু হাসিমুখে বসিয়া পুরুষজাতি সম্বন্ধে সেই অপূর্ব্বার প্রগল্‌ভতা শ্রবণ করিলেন। পুরুষজাতি সম্বন্ধে তাহার অভিনব নিন্দাগুঞ্জন, বসন্ত কোকিলের প্রথম কুহুরবের ন্যায় তাঁহার মুগ্ধ কর্ণে ধ্বনিত হইল। পুরুষকে তাচ্ছিল্য করিয়া, তিনি আর কোনও রমণীকে তেমন নূতন কথা বলিতে শুনেন নাই। যাহা অভিনব, যাহা নূতন, তাহাতে বোধ হয় একটা মনোহারিত্ব আছে। ডাঃ বসু তাহা অনুভব করিলেন।

পুরুষের রূপের নিন্দা করিতে করিতে, ডাঃ বসুর মুখের দিকে চাহিয়া, কি জানি কেন, প্রাণতোষিণী একবার থামিয়াছিল। বাক্যের এই ক্ষণিক বিরামের জন্য সে আত্মশাসন করিয়া পুনরায় কহিল, "আপনাদের মত অপদার্থদের মধ্যে কি আছে, ভগবান জানেন, যা দেখে আমার সখীর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে দুবার দুবার মুগ্ধ হল, আর বিবাহ নামক বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিল।"

ডাঃ বসু। আপনি তাকে কি করে বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার করবেন? সে ত আগেই বিবাহে সম্মতি দিয়েছে।

প্রাণ। ঐটে ভারি খারাপ কায করে ফেলেছে। তবু আমি তাকে রক্ষা করতে পারব; আমি এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেব না। আমার স্বজাতিকে যদি পুরুষের কর্কশ কবল হতে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে নিজেকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলে জানব।

ডাঃ বসু। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন? কাউকে বিপদ সাগর হতে উদ্ধার করতে হলে, নিজেও বিপদ সাগরে নামতে হয়। জলে না নামলে মজ্জমানকে উদ্ধার করা চলে না।

প্রাণ। আপনি বোধ হয় মনে করেছেন যে, সুকুমারীকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি বিপদ সাগরে ঝাঁপ দেব, অর্থাৎ নিজে একটা পুরুষকে বিয়ে করে ফেলব। তা কখনই হবে না' প্রাণকান্ত বাবু।—ঈস্! আপনাকে ডাঃ বসু না বলে প্রাণকান্ত বলে ফেলেছি। মাফ্ করবেন; আপনার সঙ্গে এই প্রথম আলাপে এতটা স্বাধীনতা নেওয়া আমার উচিত হয়নি। আপনি হয়ত আমাকে কত বেহায়া মনে করবেন!

বাস্তবিকই প্রাণতোষিণী ডাঃ বসুর সহিত যে ভাবে কথা কহিতেছিল, চিরপরিচিতের সহিতও কেহ সেভাবে কথা কহে না। প্রাণতোষিণী নিজেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু প্রাণতোষিণীর কি হইয়াছিল জানি না, সে ডাঃ বসুকে নিতান্ত পুরাতন পরিচিত ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারে নাই। এটা হৃদয় দৌর্ব্বল্য, না প্রেম?

ডাঃ বসু বেহায়ার প্রফুল্ল মুখের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া

হাসিয়া কহিলেন, "আপনি আমাকে প্রাণকান্তই বলবেন ; আমি তাতেই বেশী সুখী হব।"

ডাঃ বসুকে হাসিতে দেখিয়া প্রাণতোষিণীও হাসিল ; হাসিয়া কহিল, "তা আমি জানি। মেয়েরা পুরুষদের প্রাণকান্ত বল্লে, শুনেছি, সকল পুরুষই সুখী হয়। কিন্তু আমি যদি আপনাকে প্রাণকান্ত বলি, আর তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আপনি যদি আমাকে প্রাণতোষিণী বলেন, তাহলে লোকের মনে একটা বিশ্রী ধারণা জন্মাতে পারে। এজন্যে আমিও আপনাকে প্রাণকান্ত বলবো না, আপনিও আমাকে প্রাণতোষিণী বলবেন না।"

ডাঃ বসু। তাহলে আপনাকে কি বলে সম্বোধন করবো ?

প্রাণ। আমাকে মিস্ বানার্জ্জি বল্‌বেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আংটী।

প্রাণতোষিণীর সহিত গল্প করিতে করিতে ডাঃ বসু সময় ও সুকুমারীর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে আপন মণিবন্ধ সংলগ্ন ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। বাঃ, একজন রোগীকে দেখিবার নির্দ্দিষ্ট সময় যে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে! তিনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "আমি আপনার অনুমতি নিয়ে উঠবো। একজন রোগীকে এখনই দেখতে যাওয়া দরকার।"

প্রাণ। সুকুমারীর সঙ্গে দেখা করবেন না?

ডাঃ বসু। ওঃ, সুকুমারী! যে জন্যে আমি সুকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, সে কাযের ভার যদি আপনার হাতে দিয়ে যাই, তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?

আমরা জানি, প্রায় দুইঘণ্টা কাল ডাঃ বসুর নিকটে বসিয়া গল্প করার পর প্রাণতোষিণীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, ডাঃ বসুর যে কোন কায করিতে সে আর কখনই রাগ করিতে পারিত না; ডাঃ বসুর সকল কাযের ভার সে হেলায় আপন স্কন্ধে বহন করিতে পারিত। সে মনে মনে ভাবিল, যেন তাঁহার সকল কাযের ভার চিরদিনই বহিয়া আসিয়াছে, এবং চিরদিনই বহিবে। কিন্তু প্রকাশ্যে মনোভাব গোপন করিয়া কহিল, "কি কাযের ভার আমাকে

দেবেন ? সে ভারটা যদি একান্ত আমার পক্ষে সহনীয় না হয়, তাহলে অগত্যা সুকুমারীর জন্যে আপনাকে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ডাঃ বসু তাড়াতাড়ি কহিলেন, "না, না, আর আমি একটুও অপেক্ষা করতে পারব না; বড় দেরী হয়ে গেছে। সুকুমারীকে দেবার জন্যে এই বিয়ের আংটীটা আমি কলকাতা থেকে এনেছিলাম। এটা যদি তাকে দেবার জন্যে আপনি রেখে দেন, তাহ'লে আমার ভারি উপকার হয়।" এই বলিয়া ডাঃ বসু পকেট হইতে মখমল মণ্ডিত আংটীর কৌটা বাহির করিয়া দিলেন।

পুষ্পসন্নিভ করতল পাতিয়া প্রাণতোষিণী সহজেই তাহা গ্রহণ করিল; এবং পুষ্পসন্নিভ অধরৌষ্ঠে আনন্দের মৃদু আন্দোলন তুলিয়া কহিল, "আপনি একটু দাঁড়ান; আগে আমি আংটীটা আমার আঙুলে পরে দেখি, যে এটা সুকুমারীর আঙুলে হবে কি না, তারপর যাবেন।—আমাদের দুজনের আঙুলেই ঠিক সমান মাপের আংটী হয়।"

ডাঃ বসু কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রাণতোষণীর কথায় অথবা তাহার সুন্দর মুখ আর একবার দেখিবার লালসায় তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দেখিলেন, প্রাণতোষিণী ক্ষুদ্র করঙ্ক হইতে রত্নাঙ্গুরীয় বাহির করিয়া লইল; তাহা ঘুরাইয়া একবার দেখিল; সে ঘূর্ণনে অঙ্গুরীয়-নিবদ্ধ রত্নসকল এবং প্রাণতোষিণীর চক্ষুর্দ্বয় উভয়ই আনন্দজ্যোতিঃ উদ্গীরণ করিল। তাহার পর, সে ডাঃ বসুর মুখের দিকে চাহিয়া, হাসিয়া, হেলায়

আপন অনামিকাতে ধারণ করিল ; পুষ্পদল মধ্যে মধুমক্ষিকা যেন হেলায় আপন যোগ্য স্থান গ্রহণ করিল। ডাঃ বসু মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন যে, সেই ললিত অঙ্গুলিকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গুরীয় যেন হাসিয়াউঠিল ; চম্পককলিকায় প্রভাতের শিশিরবিন্দু যেন সূর্য্যালোকে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে অঙ্গুরীয়ের জন্য অঙ্গুলি, অথবা অঙ্গুলির জন্য অঙ্গুরীয় শোভাময় হইয়া উঠিল। তিনি সেই শোভায় বিহ্বল হইয়া কিয়ৎকাল বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে কষ্টে দৃষ্টি সংযত করিয়া, একটা সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ডাঃ বসুর সেই ধীর পদক্ষেপে, সেই দীর্ঘনিশ্বাসে, তোমরা কি কন্দর্পদেবের শরাঘাতের সন্ধান পাইলে ?

ডাঃ বসু প্রস্থান করিলে, প্রাণতোষিণীর মনে হইল যেন ঘরটা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে ; যেন উৎসব-গৃহের সমস্ত দীপ একটা দমকা হাওয়ায় নিভিয়া গিয়াছে। সে সেই নির্জ্জন কক্ষে একাকিনী বসিয়া ব্যথিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল, কেন এমন হইল ? সে আপন মনের কোণে কোণে সন্ধান লইয়া ভাবিল, কেন এমন হইল ?

প্রাণতোষিণী মনে মনে কি ভাবিল, আমরা তাহা জানিতে চেষ্টা করিব। কথিত আছে, স্বর্গের দেবতারাও রমণীর মনের কথাটি জানিতে পারেন না। কিন্তু আমরা উপন্যাস-লেখক, দেবতারা যাহা পারেন না, আমরা তাহা পারি। বক্ষঃ-পরীক্ষক চিকিৎসকের মত, আমরা রমণীর মনের মুখে কল্পনার চোঙা

লাগাইয়া, তাহাতে কাণ পাতিয়া তাহাদের অতি গোপনীয় হৃদয়-তত্ত্ব এক মুহূর্ত্তে অবগত হইতে পারি। প্রাণতোষিণীর প্রাণের আসল কথাটি এই যে, সে প্রথম দর্শনেই ডাঃ বসুকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। সে সুকুমারীর মুখে যাহা শুনিয়াছিল, এবং আজ ডাঃ বসুর সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা কাল কথাবার্ত্তা কহিয়া যাহা জানিল, তাহাতে সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল যে সুকুমারীও ডাঃ বসুকে ভালবাসে না, ডাঃ বসুও সুকুমারীকে ভালবাসেন না। এমতাবস্থায় প্রাণতোষিণী যদি ডাঃ বসুকে একটু ভালবাসিয়া থাকে, তাহাতে দোষ কি? ভালবাসিয়া প্রেমের আলোকে প্রাণতোষিণী নবীন দৃষ্টি লাভ করিল। আগে সে পুরুষগুলাকে লম্বা কর্কশ ও অন্তঃসারশূন্য মনে করিত; ডাঃ বসুকে দেখিয়া, সে তাহার দীর্ঘ দেহে মানব অবয়বের পূর্ণতা লক্ষ্য করিল; তাহার কর্কশতার মধ্যে দৈহিক বলের দীপ্তি দেখিল; তাঁহার অন্তঃসারশূন্য অন্তঃকরণ তাহার চক্ষে, অপরিমেয় প্রেমের আধার হইয়া গেল। প্রাণতোষিণী প্রকাশ্যে যাহাই বলুক, সে অন্তর মধ্যে একবারও ভাবে নাই যে ডাঃ বসুর গোঁফ যোড়াটা মিশিমাখা দাঁতবুরুশের মত, বরং সে ভাবিয়াছিল যে ডাঃ বসুর ঠোঁট-কোকনদের উপর এক সারি ভ্রমর বসিয়াছে। আপন মনের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রাণতোষিণী বিব্রত হইয়া ভাবিল, কেন এমন হইল? ইহাকেই কি লোকে প্রেম বলিয়া থাকে? একবার আপন অঙ্গুলিতে ডাঃ বসুর প্রদত্ত অঙ্গুরীয় দেখিয়া সে ভাবিল, হয়ত আলাদিনের প্রদীপের ন্যায়, এই আংটীতে কোনও দৈবশক্তি নিহিত আছে,

সেই দৈবশক্তি কি তাহার অন্তর মধ্যে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? সেই প্রভাবের বলেই কি সে আজ পুরুষ জাতীয় ডাঃ বসুকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিল? প্রাণতোষিণী নব্যতন্ত্রের, লোক, দৈবশক্তিতে তাহার আস্থা ছিল না। তথাপি সে পরীক্ষার জন্য, অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়টি উন্মোচিত করিয়া, তাহা কৌটার মধ্যে বদ্ধ করিয়া দূরে এক টেবিলের উপর রাখিয়া আসিল। কিন্তু অঙ্গুরীয়ের রত্নসকল তাহার হৃদয়মধ্যে যে বিদ্যুৎপ্রভা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ত নিভিল না। হায় হায়! প্রাণতোষিণী কি করিবে? অবশেষে, অন্যা দুর্ব্বলা কামিনীগণের ন্যায়, সেও কি পুরুষের ক্রীতদাসী হইয়া জীবন কাটাইবে? ধিক্ বিধাতা! সেই উন্মুক্ত আকাশের স্বাধীন বিহঙ্গিনীকে কেন পিঞ্জরে পূরিবার উদ্যোগ করিতেছ? প্রাণতোষিণী আপনার দুর্ব্বল নারীহৃদয়কে শত বার ধিক্কৃত করিয়া ভাবিল, কেন সে সুকুমারীর আহ্বানে ওয়াল-টেয়ারে আসিল? যদি আসিল, তবে কেন সে ডাঃ বসুর ন্যায় সুপুরুষকে দেখিল? দেখিয়া কেন তাহার প্রদত্ত অন্যের বিবাহ অঙ্গুরীয় আপন অনামিকাতে ধারণ করিল? এখন সে ডাঃ বসুর চিন্তা কিরূপে মন হইতে দূর করিবে? তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল?—ডাঃ বসুর চিন্তা ত্যাগ করিতে হইলে তাহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। নদী যেমন স্বতঃই সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, প্রসূনবল্লরী যেমন নিকটবর্ত্তী বিটপীশাখায় আশ্রয়-লাভের জন্য তন্তুবিস্তার করিয়া প্রধাবিত হয়, ঔদরিক যেমন আহার আশায় উৎসবগৃহের দিকে ছুটিয়া যায়, প্রাণতোষিণীর মনটাও

তেমনই ডাঃ বসুর চিন্তায় ধাবিত হইল ও তাহাতে বিজড়িত হইয়া রহিল। প্রেমটাকে যে একদিন হাসির কথা বলিয়া উড়াইয়া দিত,—কি লজ্জা!—আজ সে তাহাতেই বিহ্বল হইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সুকুমারী ম্লান মুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া বিকলা বিহ্বলা প্রাণতোষিণী আপনাকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া লইল; এবং মুখে প্রফুল্লতা আনিয়া কহিল, "তুমি এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলে? তোমার জন্যে ডাঃ বসু কতক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর তুমি এলেনা দেখে, আমার কাছে তোমার আংটীটা রেখে চলে গেলেন।"

সুকুমারী চকিত নেত্রে কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল যে ডাঃ বসু সত্যই চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার আংটী?"

প্রাণতোষিণী কহিল, "হাঁ তোমার আংটী—Engagement ring ডাঃ বসু কলকাতা থেকে কিনে এনেছেন। তোমার আঙুলে পরিয়ে দেবার জন্যে এসেছিলেন। চমৎকার আংটী—ঐ—ঐখানে টেবিলের উপর রয়েছে।"

সুকুমারী আংটী ত গ্রহণ করিলই না; প্রাণতোষিণীর নির্দ্দেশমত সেই টেবিলের দিকেও দৃষ্টিপাত করিল না। মাত্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কিয়ৎকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর প্রাণতোষিণীর সহিত গল্প করিতে বসিল। কত গল্প করিল। বিষাদবিক্ষুব্ধ স্বরে মৃত পতির কত আদরের, কত ভালবাসার, কত সদুপদেশের কত গল্প করিল। আগে পুরুষের

ভালবাসার, আদরের বা গুণের কথা শুনিলে প্রাণতোষিণীর অবিশ্বাসের হাসি হাসিত; আজ সুকুমারীর কথাগুলা তাহার কাণে যেন মধুবৃষ্টি করিতে লাগিল; সুকুমারীর কথার সুরের সহিত তাহার হৃদয়ের সুর মিলিয়া গেল, কিন্তু সে আপনার হৃদয়ের শুভ-সংবাদ সখীকে জানাইল না। প্রেমের প্রথম আনন্দ বোধ হয় সকল রমণীই হৃদয়ের গোপন কোণে লুকাইয়া রাখে।

দুই সখীতে কথা কহিতে কহিতে বৈকালিক ভ্রমণের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কক্ষমধ্যে সন্ধ্যার ছায়াপাত দেখিয়া প্রাণ-তোষিণী কহিল, "যাঃ? আজ আর বেড়াতে যাওয়া হল না।"

সুকুমারী সন্ধ্যারই মত মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, "না, আজ আমার বাইরে যাবার ইচ্ছাই ছিল না;—এ মুখ আর বাইরে দেখাতে ইচ্ছা করে না।"

প্রাণতোষিণী সুকুমারীর কথার উত্তর দিল না, কেবল ব্যথিত হৃদয়ে একটা সহানুভূতির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া, সুকুমারী আবার মৃতস্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল; —আহা! কোনও পতিব্রতা কি স্বামীর কথা বলিয়া শেষ করিতে পারে! কতক্ষণ পরে সুকুমারী বেশ পরিবর্ত্তন জন্য উঠিয়া গেল।

প্রাণতোষিণী লক্ষ্য করিয়াছিল যে, দীর্ঘ বাক্যালাপের মধ্যে সুকুমারী একবারও ডাঃ বসুর সম্বন্ধে কোন কথা কহে নাই; অধিক কি, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত একবার উল্লেখ করে নাই। আবার

কক্ষ ত্যাগ করিবার সময়, আংটীর কৌটাটিও লইয়া যাইত ভুলিয়া গিয়াছিল।

যতক্ষণ প্রাণতোষিণী বসিয়া বসিয়া সুকুমারীর দীর্ঘ কাহিনী-সকল শুনিয়াছিল, ততক্ষণ তাহার একটা দৃষ্টি সেই আংটীর কৌটাতেই নিবদ্ধ ছিল। সুকুমারী কক্ষত্যাগ করিলে, সে ত্বরায় সেই আংটীর কৌটাটি গ্রহণ করিল, তাহা আপন বক্ষে চাপিয়া ধরিল; তাহা অধরপ্রান্তে তুলিয়া চুম্বিত করিল; তাহা পুষ্পের ন্যায় নাসিকাগ্রে ধরিয়া তাহার আঘ্রাণ লইল। তাহার পর, পাগলিনী আপন শয়নকক্ষে যাইয়া, আপন পেটিক মধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিল।

আংটী কোথায় গেল সুকুমারী কখনই তাহার সন্ধান লইল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারীর সংকল্প সিদ্ধি।

একটা প্রবাদবচন প্রচলিত আছে—চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। অন্যান্য প্রবাদের ন্যায় এটিও বড় খাঁটী কথা। ডাঃ বসুর নিকট সুকুমারী যখন বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল, তখন তাহার মনের মধ্যে মোহ-নামক চোর প্রবেশ করিয়াছিল। এই মোহ বিদূরিত হইবামাত্র সুকুমারীর মনোমধ্যে সুবুদ্ধির উদয় হইল। পরক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল যে সে একটা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে। যেটাকে সে ক্ষণকালের জন্য ভালবাসা মনে করিয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে সেটা ভালবাসাই নয়; তাহা ক্ষণিক মনোবিকার মাত্র; প্রাকৃতিক প্রফুল্লতায় তাহার হৃদয়ে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা তাহারই ফল। পুণ্যময় আত্ম-জ্ঞান হইতেই ভালবাসার উৎপত্তি; সুকুমারী যাহা করিয়াছিল, তাহা আত্মজ্ঞান নহে, তাহা হীন আত্মবিস্মৃতি মাত্র। আপনাকে জানিয়া সে ভালবাসার কথা বলে নাই; যখন সে বলিয়াছিল ভালবাসি, তখন সে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল। পরে সে বুঝিল যে, কিছুমাত্র আত্মজ্ঞান থাকিলে এমন লজ্জাজনক কথা সে কখনই বলিতে পারিত না। মনোবিকারের মোহ মন হইতে অপনীত হইবামাত্র, তাহার হৃদয় একটা গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ডাঃ বসুর প্রণয়াভিনয়ে যদি কিছু মাত্র ত্রুটী না থাকিত, তাহা হইলে, কি হইত বলা যায় না; হয়ত তাঁহার প্রণয়াধিক্য দেখিয়া মনের গ্লানিটা এত বাড়িয়া উঠিত না। কিন্তু তাঁহার কৃত্রিম প্রণয়াভিনয়ে যথেষ্ট ত্রুটী ছিল;—সেই সকল ত্রুটী না রাখিলে তাঁহার ব্যবহারটা ভদ্রজনোচিত হইত না। সুকুমারী এই ত্রুটী গুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল। সুকুমারী যখন মিঃ নীরদবরণ গুপ্তকে মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিল, 'ভালবাসি' তখন তিনি সে মুখে চুম্বন করিয়া, তাহাকে আগ্রহময় আদরে বক্ষে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, —সেই প্রথম আদরের কথা, সেই প্রথম প্রেম চুম্বনের কথা স্মরণ করিয়া, এখনও সুকুমারীর সমস্ত হৃদয় শিহরিয়া উঠিত। ডাঃ বসু তাহাকে আলিঙ্গন বা চুম্বন কিছুই করেন নাই; অধিক কি তাহার করও আদরে আপন করমধ্যে গ্রহণ করেন নাই। দিবালোকে প্রকাশ্যে আলিঙ্গন বা চুম্বনে আপত্তি থাকিতে পারে বটে; কিন্তু যখন সে বিবাহে সম্মতা হইয়াছিল, তখন সেই সোপানপথ সম্পূর্ণ জনশূন্য ছিল; তখন তিনি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলে কেহ ত তাহা দেখিত না। তাহার পর, সুযোগ সন্ধান করিয়া, তাহার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়া, তিনি ত প্রেমের প্রসঙ্গ আর কখনও উত্থাপিত করেন নাই। কিংবা তাহাকে আদৃত করিবার চেষ্টা করেন নাই। আবার বিবাহের আংটীটি পর্য্যন্ত, তাহার করস্পর্শ করিয়া, তাহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দেন নাই। এ সমস্তই সুকুমারীর চক্ষে অনু-রাগের অভাব বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সুকুমারী ত জানিত

না যে ডাঃ পি, কে, বসুর ন্যায় এক জন চরিত্রবান্ ব্যক্তি, একটা তামাসা করিতে গিয়া পর স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিতে পারেন না।

মনোমধ্যে বিরাগ লইয়া এবং বাহিরে ঐ সকল ত্রুটী দেখিয়া সুকুমারী আপন মন দৃঢ় করিয়াছিল ; এবং স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে এই বিবাহ সে কখনই ঘটিতে দিত না।—স্বামীর স্বর্গীয় আদরে যে দেহ পুণ্যময় হইয়াছে, তাহা সে কখনই অন্যের কামনা-কলঙ্কিত স্পর্শে কলুষিত করিবে না ; করিতে পারিবে না। এখন সে বুঝিতেই পারিল না যে, কিরূপে সে একদিন বিবাহে সম্মতা হইতে পারিয়াছিল ; এখন সে কথা ভাবিতেও যে তাহার হৃদয় ঘোর লজ্জায় পূর্ণ হইয়া উঠে !

কিন্তু কিরূপে সে আপন সম্মতি প্রত্যাখ্যান করিবে ? তাহার মত পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া, তাহার পিতামাতা কি বলিবেন ? তাঁহারা যদি ইতিমধ্যে আত্মীয় বা বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠাইয়া থাকেন, আর সেই কার্ড পাইয়া যদি সত্যই কোনও কোনও বন্ধু ওয়ালটেয়ারে আসেন, তাহা হইলে, তাঁহারা বিবাহের নিমন্ত্রণে আসিয়া বিবাহ হইতে না দেখিলে কি মনে করিবেন ? সখী প্রাণতোষিণীকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া সে বারবার এই সকল কঠিন সমস্যার আলোচনা করিয়াছিল।

এতদিনে প্রাণতোষিণী স্থির করিতে পারে নাই যে কিরূপে সুকুমারীকে এই মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু ডাঃ বসুকে দেখিয়া অবধি, সখীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার একটা উপায় সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। আজ সেই বিবাহ

রহিতের কথা উত্থাপিত হইবা মাত্র প্রাণতোষিণী সুকুমারীকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "ঐ বেয়াড়া লম্বা ডাক্তারটাকে সত্যিই যদি তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে না থাকে, তা হলে, জানিস আমি নিশ্চয় এ বিয়ে বন্ধ করে দেব। প্রাণ দিয়ে বিয়ে বন্ধ করে শুধু 'তোষিণী" হয়ে থাকবো।"—শুধু প্রাণ নয়, প্রাণতোষিণী তাহার সর্ব্বস্ব ডাঃ বসুকে আগেই দিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রাণতোষিণীর আশ্বাসবাক্য শুনিয়া সুকুমারী কহিল, "তুই যদি এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারিস, আমি চির কাল তোর গোলাম হয়ে থাকবো।"

প্রাণতোষিণী হাসিয়া কহিল, "যদি গোলাম হ'তে চাস্, তা" হলে রঙের গোলাম হোস। কিন্তু আমি তোকে উদ্ধার করবই। আমি শুধু ভাবি, তুই অমন একটা অপদার্থকে একবারও কেন বিয়ে করতে সম্মত হলি।"

সুকুমারী ম্লান মুখে কহিল, "ডাঃ বসু অপদার্থ নন। তাঁর রূপ আর গুণ দুইই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বিয়ের করতে হলে, অমন লোককেই বিয়ে করা উচিত। কিন্তু আমি আর বিয়ে করতে পারবো না ;—এ বুকে আর কারও জায়গা নেই। স্বামীর ভালবাসায় এখনও এ বুকটা কাণায় কাণায় ভরা রয়েছে। তাঁর ভালবাসাটা সে কি বস্তু, তা ত তুই বুঝতে পারবিনে। তুই ত এখনও ভালবাসতে শিখিস্‌নি।"

এই কয়েক দিনে, ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা প্রাণতোষিণী অন্তরের কোণে কোণে বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিল। ভাল-

বাসার আনন্দে, ভালবাসার ব্যথায়, ভালবাসার সহস্র বিচিত্রতায়, তাহার নবীন হৃদয় মত্তমারুত-সন্তাড়িত মহাসাগরের ন্যায় সর্ব্বদা সন্তাড়িত হইতেছিল। তথাপি দুষ্টা আপন মনোভাব আপন বাল্য সহচরীর নিকট গোপন রাখিল। আমরা জানি, প্রেমিকারা হৃদয়ের নূতন ভালবাসার কথাটি সহজে কাহাকেও জানিতে দেয় না; মর্ম্মের দ্রব্য মর্ম্মমধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে চায়। কিন্তু তাহারা কি কৃতকার্য্য হইতে পারে? বিকচ কুমুদ কি আপন সৌরভ আপন হৃদয় মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারে? কুসুম সৌরভ যেমন সহজেই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, প্রেমিকার হৃদয় নিহিত প্রেমও তেমনই মুখমণ্ডলের রক্তরাগে, বিতত নয়নের বিহ্বল বীক্ষণে, ওষ্ঠাধরের ঈষৎ কম্পনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; ফুটন্ত দুগ্ধের ন্যায় প্রেমিকার প্রত্যেক কথায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের তপ্ত প্রেম উছ্-লাইয়া পড়ে।

সুকুমারীর কথা শুনিয়া সস্মিত মুখে প্রাণতোষিণী কহিল, "ভালবাসাটা কি রকম, ভাই, তুই আমাকে শিখিয়ে দিতে পারিস? মনে কর, যদি তোর ওই লম্বা ডাক্তারটাকে আমি ডাক্তার না বলে প্রাণকান্ত বলি, তাহলে কি সেটা ভালবাসা হবে? প্রথম আলা-পের দিনই সে বলেছিল যে তাকে ডাক্তার না বলে প্রাণকান্ত বল্লে সে বেশী সুখী হবে। আমি বল্লাম যে তাতে লোকে একটা কু ভাবতে পারে, তার চেয়ে ডাঃ বসু বলাই ভাল।"

সুকুমারী কোনও কথা বলিল না। কিন্তু মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া ও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, সখীর মুখ ও চক্ষু বিশেষ ভাবে

পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রাণতোষিণী কিছু বিচলিত হইয়া পড়িল; ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ-ছিস্?"

সুকুমারী হাসিয়া কহিল, "তোর মুখ চোখে প্রেমের চিহ্ন আছে কি না তারই সন্ধান করছি।"

সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে ত সুকুমারীর মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছে! তাহার মুখে কি তাহার হৃদয়নিহিত গোপন প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে? প্রাণতোষিণী হৃদয়ভাব গোপন করিতে যাইয়া আপন মুখমণ্ডল আরও রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল; তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল; তাহার দৃষ্টিটা কিছু বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মুখে চোখে কিছু প্রেমের সন্ধান পেয়েছিস্?"

সুকুমারী সখীর মুখমণ্ডলের সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া হাসিল; হাসিয়া কহিল, "আগে পাইনি, এখন পেলাম। তোর রাঙ্গা মুখখানি দেখে তোর মনের কথা সবই বুঝতে পেরেছি। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি তুই ডাক্তার বন্ধুকে ভালবেসে ফেলেছিস!"

প্রাণতোষিণী। দেৎ! ওই লম্বা! ছি ছি! আমার কি মরবার যায়গা নেই যে ঐ ওকে ভালবাসব? কিন্তু লোকটার জন্যে—সত্যি বলছি—আমার মনে মনে একটু দুঃখও হয়।

সুকুমারী। কেন?

প্রাণতোষিণী। যে দিন লোকটাকে বলব যে আমার সই Dolphins nose থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে,

তবু তার মত অকাল কুষ্মাণ্ডকে বিয়ে করবে না, সে দিন তার মুখটা কি রকম হয়ে যাবে, তাই ভেবে ভেবে আমার মনে একটু কষ্ট হয় বই কি? বেচারা কি কষ্টেই পড়বে!

সুকুমারী। সেই কষ্ট তুই নিবারণ করিস।

প্রাণতোষিণী। সত্যি বল্‌ছি ভাই! সেই দুঃখী দুঃখী মুখটা ভাবলে, তা কোলে নিয়ে আমার হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে।

সুকুমারী। দেখ, আমি ক'দিন লক্ষ্য করেছি যে তিনি তোর সঙ্গে কথা কইতে পেলে, তোকে নিয়ে বেড়াতে গেলে, যেমন সুখী হ'ন, আমার সঙ্গে থাকলে তেমন সুখী হন না। এতে মনে হয় তিনি তোকে ভালবাসেন। বিয়েতে আমার অসম্মতি আছে জানতে পারলেই, তিনি তোকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করবেন। তখন তুই তাকে সম্মতি দিস্।

প্রাণতোষিণী। যদি ঐ মড়াকাটা পুরুষটাকে সত্যিই বিয়ে করবার প্রবৃত্তি হয়, তা হলে বিয়ের প্রস্তাবটা আমি নিজেই করবো; প্রস্তাবটা তাকে করতে দেব না।

সুকুমারী। না না, নিজে প্রস্তাব করিস্‌নে। নিজে প্রস্তাব করা মেয়েমানুষের পক্ষে ঠিক নয়। যদি কোন কারণে বিয়ে করতে না চায়, তাহলে বড়ই লজ্জা পেতে হবে।

প্রাণতোষিণী। সুকু, তুই কি বলিস্? আমাকে বিয়ে করবার জন্যে টাকা নিয়ে, বিদ্যে নিয়ে, গণ্ডা গণ্ডা ষণ্ডা আমার চলবার পথে বুক পেতে দিয়েছে। তবু তাদের দিকে আমি

ফিরেও চাইনি। সেই আমি, বিয়ে করতে চাব, আর ওই অপদার্থ মড়াকাটা ডাক্তারটা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে? এটা কি কথার মত কথা হল?

সুকুমারী সেই অপূর্ব্বার অপূর্ব্ব গৌরবান্বিত অতি সুন্দর মুখ-মণ্ডল দেখিয়া বুঝিল যে, সে মুখের বিবাহপ্রস্তাব কোন পুরুষ রক্তমাংশের শরীর লইয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। ডাঃ বসু অতি সহজেই প্রাণতোষিণীর প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। প্রাণ-তোষিণীকে ডাঃ বসু বিবাহ করিলে, সে যে বিপদে পড়িয়াছে তাহা হইতেই সহজেই উদ্ধার পাইবে; এবং ইহাতে কাহারও মনে কোন ক্ষোভ থাকিবে না। ডাঃ বসুও প্রাণতোষিণীকে লইয়া অধিকতর সুখলাভ করিতে পারিবেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাণকান্তের পত্র।

আজ ২৬শে ডিসেম্বর। আর পাঁচ দিন বাদে সুকুমারীর বিবাহ হইবে। কলিকাতা হইতে বিবাহের দ্রব্য সকল আসিয়াছিল। তাহা গুছাইয়া রাখিতে এবং বিবাহ সম্বন্ধে অন্যান্য উদ্যোগ করিবার জন্য মিঃ অরুণোদয় দত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহারাদির পর তিনি কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন, "সুকু, আমার ত আর একটুও অবকাশ নেই। প্রাণতোষিণীকে নিয়ে তুমি এই নিমন্ত্রণের কার্ড গুলো আজই পাঠাতে চেষ্টা কর। যাঁদের কাছে কার্ড ক'খানা পাঠাতে হবে, তাঁদের নাম আর ঠিকানা আমি এই ফর্দ্দে লিখে রেখেছি; এই নাও।" এই বলিয়া মিঃ দত্ত কন্যার হস্তে এক তাড়া কার্ড ও একটি তালিকা প্রদান করিলেন।

সুকুমারী ম্লান মুখে ও কম্পিত হস্তে কার্ডগুলি ও তালিকাটি গ্রহণ করিল। ফর্দ্দে উনপঞ্চাশটি নাম ছিল। সে ধীরে ধীরে গণিয়া দেখিল যে, কার্ডের সংখ্যাও উনপঞ্চাশ। সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "উনপঞ্চাশ খানা?"

মিঃ দত্ত কহিলেন, "হাঁ উনপঞ্চাশ খানা। পঞ্চাশখানা ছাপিয়ে আনা হ'য়েছিল। তার একখানা কোন বন্ধুকে দেবার জন্যে প্রাণকান্ত আজ সকালে নিয়ে গেছে।"

ফর্দ্দটি ও কার্ডগুলি লইয়া সুকুমারী প্রাণতোষিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। প্রাণতোষিণী কহিল, "দেখছি, দৈব আমাদের অনুকূলে। কার্ডগুলি আমাদের হস্তগত হওয়ায় মস্ত একটা ঝঞ্ঝাট থেকে সহজেই উদ্ধার পাওয়া যাবে।"

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করে?"

প্রাণতোষিণী বলিল, "বুঝতে পারছ না? কার্ডগুলি আমরা মোটেই পাঠাব না। আমার বাক্সের মধ্যে তুলে রাখব। তা হলেই কলকাতা থেকে কি অন্য কোন জায়গা থেকে কোন লোকের আসবার সম্ভাবনা থাকবে না। দাও, ওগুলো আমাকে দাও।"

প্রাণতোষিণীর হস্তে কার্ডগুলি সমর্পণ করিয়া সুকুমারী নিশ্চিন্ত হইল। মনে কতকটা শান্তি লাভ করিয়া ভাবিল, আর কেহ তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে না; আসিয়া বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত দেখিয়া, হাসিয়া, বন্ধুগণের নিকট চিরকাল গল্প করিবার জন্য বাটী ফিরিয়া যাইবে না। একটা মস্ত লজ্জার হস্ত হইতে সে পরিত্রাণ লাভ করিবে। কেবল ডাঃ বসুর একটি বন্ধু আসিবেন। তা আসুন; এক জন আসিলে, কিছু ক্ষতি হইবে না; একটা মুখের বাক্যে কুৎসার তরঙ্গ উঠিবে না। কিন্তু ডাঃ বসুর এই বন্ধুটি কে? এরূপ কোনও বিশেষ বন্ধুর কথা সুকুমারী ত কখনও তাঁহার নিকট শ্রবণ করে নাই। এই বন্ধু কোথায় থাকেন? ওয়ালটেয়ারে থাকিলে, ডাঃ বসু নিশ্চয় তাঁহার সহিত সুকুমারীর পরিচয় ঘটাইয়া দিতেন। বন্ধুটি বোধ

হয় কলিকাতার লোক। তিনি কি সুকুমারীদিগের নিকট পরিচিত? তা, হোন পরিচিত। একটি মাত্র পুরুষ পরিচিতের অপবাদে সুকুমারীর ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না।

ডাঃ বসুর এই বন্ধুটি কে, এস, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি। সেই দিন বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় আপন সুসজ্জিত; কোমল কার্পেট মণ্ডিত পাঠাগারে বসিয়া, দেখ, ডাক্তার বসু কি করিতেছেন? তিনি বন্ধু নীরদবরণ গুপ্তকে এক খানা দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিয়াছেন। কতক্ষণে পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই পত্রের সহিত সেই নিমন্ত্রণের কার্ড খানি পাঠাইয়া দিলেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি ঐ কার্ড খানি বন্ধুকে পাঠাইলেন, তাহা নিম্নের পত্র খানি পাঠ করিলে তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে।

পত্র।

শান্তিধাম, ভিজাগাপত্তম।
২৬ এ ডিসেম্বর, ১৯...।

ভাই নীরদবরণ,

কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রেমলীলায় আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম, তাই যথা সময়ে তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। আমার এই প্রেমলীলার কথা শুনিয়া তুমি হাসিও না; হাসিবার কোনও কারণ নাই। কেননা, এই প্রেমলীলাটা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রেমগন্ধহীন—আমার পক্ষে উহা একটা অভিনয় মাত্র।

তুমি—— 'ফিরেছ সন্ধানে যার নিশি দিন ধরে
কাননে, কান্তারে, শৈলে, তীর্থে,—ধর্ম্ম কর্ম্ম
প্র্যাক্‌টিস্ সব বিসর্জ্জিয়া—তোমার সেই কান্তা—

সেই সুকুমারী মাসাবধি কাল এই ওয়ালটেয়ারেই বাস করিয়া দেহশ্রী বর্দ্ধিত করিতেছেন; এবং তোমার অভাবে আমার সহিত প্রেমলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখানে আমি না থাকিলে বোধ হয় অন্য লোকের সহিত প্রেমলীলা করিতেন; কারণ এই প্রেমময়ীরা প্রেমলীলা ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারেন না। অন্য লোকের সহিত প্রেমলীলা করিলে, তোমার কপাল একবারে ভাঙিত; কারণ, জানিও, আমার প্রেমলীলা জাল হইলেও শ্রীমতীর প্রেমলীলা জাল নহে।

তোমাকে সুশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য আমি পবিত্র প্রেমের যে বাহ্যিক অভিনয় দেখাইতেছি, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তোমার বিধবা পত্নী আমাকে পবিত্র পরিণয় সূত্রে বাঁধিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। আগামী ১লা জানুয়ারী শুভ বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে শুভ লগ্নে বিবাহ হইবে। তাহার পূর্ব্বে তুমি ওয়ালটেয়ারে আসিয়া তোমার পতিগত প্রাণার কোমল কবল হইতে আমাকে উদ্ধার কর।

আমার প্রতি তাঁহার প্রেমাধিক্য লক্ষ্য করিয়া, একটু মজা করিবার জন্য, তোমার জীবিত থাকার সংবাদটা আমি এখনও তাঁহাকে প্রদান করি নাই। আপনাকে বিধবা 'জানিয়াই, আশু

বৈধব্য-দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি আমার উপর কুহক জাল বিস্তার করিয়াছেন। অবশ্য আমি তাঁহার জালে ধরা পড়িব না। কিন্তু তুমি আসিলে খুব একটু মজা হইবে। তিনি আবার পুরাতন সুরে তোমার কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়া কহিবেন যে তুমিই তাঁহার অনন্যগতি। এবং তুমি তাঁহার শ্রীমুখ নির্গত কথাটিকে বেদবাক্য মনে করিয়া তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িবে। ছিঃ! ছিঃ! তোমাদের মত স্ত্রৈণ পুরুষের দুর্ব্বলতার জন্যই সবল স্বাধীন সক্ষম পুরুষ জাতিকে অবলাগণ তুচ্ছ খেলার জিনিষ মনে করে। এইবার দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধে তোমাদের গর্ব্ব আমি চূর্ণ করিব ;—

——ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্ব সম।"

তোমার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন জন্য আমি এই পত্রের সহিত একখণ্ড কার্ড পাঠাইলাম। উহা তোমার বিধবা পত্নীর বিবাহোপলক্ষে তোমার শ্বশুর মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। কন্যার এই দ্বিতীয় বিবাহে তিনি প্রায় পঞ্চাশ জন বন্ধু ও আত্মীয়কে আহ্বান করিয়াছেন। নিমন্ত্রিতগণ আমার বিবাহ দেখিবেন না বটে, কিন্তু মৃতপতির সহিত বিধবা পত্নীর শুভ সম্মিলন দেখিয়া ধন্য হইবেন। তাহাতেই মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহারা বাটী ফিরিবেন ; এবং যাহাতে আপন আপন পত্নীগণ সহজে বিধবা হইতে না পারে তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

তুমি কবে আসিবে, তারে সংবাদ পাইলে, আমি ষ্টেশনে যাইয়া তোমাকে লইয়া আসিব। তাহার পর তোমাকে সুসজ্জিত করিয়া, একেবারে তোমার বিধবা পত্নীর বিবাহের বাসরে লইয়া যাইব। তুমি আপন প্রিয়তমা পত্নীর বিবাহ সজ্জা দেখিয়া ধন্য হইও।

একটা কথা শুনিলে তুমি বিশেষ সুখী হইবে, তোমার বিধবা পত্নী উত্তম শারীরিক স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছেন; বৈধব্য দুঃখে কিছুমাত্র শুষ্ক হন নাই। সম্প্রতি নূতন বিবাহের আনন্দে তিনি সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহার বিবাহোৎসবে যোগ দিবার জন্য তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহার একটী বাল্যসখীকে ডাকিয়া আনিয়াছেন; তাহার সহিত হাস্যে ও রহস্যে সুখের দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছেন।

এই বাল্যসখীর নাম প্রাণতোষিণী। প্রাণতোষিণী অত্যন্ত সুন্দরী; তেমন সুন্দরী তুমি কখনই দেখ নাই। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যকে আমি বড়ই ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমার মনে হয় তাহাদের এই সৌন্দর্য্য বিষধরের চক্রের ন্যায়; তাহার মধ্যে বিষময় দন্ত লুক্কায়িত থাকে; সেই দন্তের দংশনে পুরুষেরা প্রাণ হারায়। এই প্রাণতোষিণী সম্বন্ধে দুই একটা কথা তোমাকে আমি লিখিতাম। কিন্তু তাহার কথার বিস্তারিত আলোচনা করিলে পাছে তুমি মনে কর যে, সে আমার মনোমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, এজন্য কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলাম না।

তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার এ শক্ত চামড়ায় তাহার বিষদাঁত কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইতি।

তোমার চিরদিনের—

প্রাণকান্ত।

পত্রখানা ডাকঘরে দিবার জন্য বেহারার হাতে সমর্পণ করিয়া ডাঃ বসু নিশ্চিত হইলেন। মনে করিলেন, তাঁহার কৌশলে, নারীপ্রেমের অসারত্ব শীঘ্রই প্রমাণিত হইয়া যাইবে। হায়! তিনি ত জানিতেন না, যে বিধাতার ইচ্ছায়, সেই দিনই তিনি নিজেই নারীপ্রেমে সম্পূর্ণ বিজড়িত হইয়া যাইবেন; রমণীর সৌন্দর্য্যের বিষদন্তে তাঁহার শক্ত চামড়া শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। নারীপ্রেমের অসারতা বুঝাইবার জন্য তিনি যে কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, বিধাতার চক্রে পড়িয়া তাহা দুই দণ্ডের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া ডাঃ বসু হর্ষান্বিত মনে, বেশ পরিবর্ত্তন জন্য পোষাক কামরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রোগী দেখিতে যাইবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি পোষাক কামরা হইতে বাহির হইয়াই দেখিলেন যে তাহার জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা আমরা পরবর্ত্তী দুইটি পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাণতোষিণীর তিনটি উদ্দেশ্য।

ডাঃ বসুর উপরিউক্ত পত্রখানা লইয়া বেহারা ডাকঘরে যাইতেছিল। ফটকের নিকট যাইয়া সে বাধাপ্রাপ্ত হইল।

একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী হইতে ধীরে অবতরণ করিয়া প্রাণতোষিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বেয়ারা, ডাক্তার সাহেব ঘরমে হ্যায় ?'

বেহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। রাজরাণীর মত তেমন রমণীকে সে কখনও ডাক্তার সাহেবের দ্বারে আসিতে দেখে নাই। তাহার উপর আরও বিস্ময়ের কারণ এই যে, রমণী একাকিনী আসিয়াছেন। বিস্ময়ে সে প্রথমটা প্রাণতোষিণীর কথার উত্তর দিতে পারে নাই। প্রাণতোষিণী পুনরায় প্রশ্ন করিলে, সে সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া কহিল, "জী! হুজুর! ডাক্তার সাহেব অভি ঘরমে হ্যায়। খবর দেগা ?"

প্রাণ। নেই ; খবর দেনে নেই হোগা। হাম আপসে. বোলায়েগা। তোমরা হাতমে কিস্‌কা চিঠি ? হামরা ?

বেহারা চিঠির ঠিকানা দেখাইবার জন্য তাহা প্রাণতোষিণীর হস্তে দিল। ঠিকানা দেখিয়া প্রাণতোষিণী চম্‌কাইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে যদি আকাশের কিয়দংশ তাহার নয়নাগ্রে খসিয়া পড়িত, অথবা পুরাকালে যমরাজ যেমন পতিবিয়োগবিধুরা

সাবিত্রীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনই যদি তাহার পার্শ্বে আসিয়া পাশহস্তে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলে সে ততটা বিচলিতা হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে বেহারার নিকট আপন মনশ্চাঞ্চল্য গোপন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছিল। আপনাকে সম্বৃত করিয়া এবং মিঃ গুপ্তের ঠিকানাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া সে অবিলম্বে পত্রখানি বেহারার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিল, "নেই চিঠি হামরা নেই, তোম ডাকমে লে যাও।"

বেহারা পুনরায় প্রাণতোষিণীকে সেলাম করিয়া চিঠি লইয়া চলিয়া গেল।

বেহারা চলিয়া গেলে প্রাণতোষিণী একবারমাত্র ভাবিয়াছিল, গাড়ীখানা হাজির রাখিবে কিংবা ছাড়িয়া দিবে? পরমুহূর্ত্তে সে হাসিয়া ঠিক করিয়া লইল যে ডাঃ বসুর মোটরগাড়ীখানায় তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অতএব ভাড়াটিয়া গাড়ী হাজির রাখিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হইবে না। সে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পরে বিবিধ পুষ্পচিত্রিত চক্রাকার উদ্যান পথ অবলম্বন করিয়া, অতি মনোহর ও প্রশস্ত পুষ্প ক্ষেত্রসকল অতিক্রম করিয়া সে ডাঃ বসুর সুগঠিত বাটীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। আহা! তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপে উদ্যানমধ্যে যেন রাশি রাশি সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রস্ফুট পুষ্পসকল যেন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার অপূর্ব্ব রূপ দেখিতে লাগিল। তাহার রূপালোকে যেন ডাঃ বসুর ভদ্রাসন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নন্দন-বিচারিণী দেব-

বালার ন্যায় সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যদি তৎকালে ডাঃ বসু আপন উদ্যান মধ্যে দেখিতেন, তাহা হইলে ঐ উদ্যানবৃক্ষের ন্যায় তিনিও মহা বিস্ময়ে চলৎশক্তি রহিত হইয়া যাইতেন।

মন্থরগমনে যাইতে যাইতে প্রাণতোষিণী সেই পত্রখানার কথা ভাবিতেছিল। যদি পত্রখানায় ঠিকানা থাকিত, 'দি রম্ভানিকেতনং, স্বর্গং' আর যদি বর্ত্তমান ডাক প্রণালীতে পরলোকে ডাকবিলির ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে প্রাণতোষিণী ভাবিত যে ডাঃ বসু পরলোকেই মৃত বন্ধুকে পত্র লিখিতেছেন। কিন্তু কলিকাতা ত নরলোকেরই সহর; এই নরলোকের সহরের হোটেলে, মানুষ ত মৃত অবস্থায় বিচরণ করে না; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে মিঃ গুপ্ত নিশ্চয় জীবিত আছেন; এবং তিনি কোথায় কি ভাবে জীবিত আছেন, তাহা ডাঃ বসু জানেন। জানিয়া তিনি সে সংবাদ তাঁহার পত্নীকে প্রদান করেন নাই কেন? জানিয়া অন্যের সধবা পত্নীকে বিবাহ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন কেন? সুকুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া কি ডাঃ বসু কৌশলে তাহাকে পাপ পথে লইয়া যাইতেছেন? প্রাণতোষিণী ডাঃ বসুর ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুকুমারীর নিকট যাহা শুনিয়াছে, এবং এই কয়েক দিনে সে নিজে যাহা লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে ত তাঁহাকে অধার্ম্মিক বা কুচরিত্র বলিয়া মনে হয় নাই; বরং ধর্ম্মভীরু বলিয়াই মনে হইয়াছে। এই ধর্ম্মভীরুতার জন্যই তিনি বিবাহের পূর্ব্বে ভাবীপত্নীর মুখচুম্বন করেন নাই; এবং তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্রতা দেখান নাই। আবার আজ দুই দিন তিনি

মোটেই সুকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই ; মিঃ দত্তের সহিত অল্পকালের জন্য সাক্ষাৎ করিয়া চুপি চুপি চলিয়া গিয়াছেন। এ সকল ত নারীরূপান্ধ মুগ্ধ মানবের লক্ষণ নহে। তবে এই অনুচিত বিবাহের উদ্দেশ্য কি ? নিশ্চয় ইহার ভিতর একটা কিছু গূঢ় রহস্য আছে। প্রাণতোষিণী প্রতিজ্ঞা করিল, এই রহস্যের উচ্ছেদ না করিয়া সে বাটী ফিরিবে না।

প্রাণতোষিণী ডাঃ বসুর বাটীতে কেন আসিয়াছিল ? যদি আসিল, ত একাকিনী আসিল কেন ? তাহার মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যুবতীর পক্ষে এক যুবকের নারীহীন পরিশুষ্ক বাটীতে আসা উচিত হয় নাই। এ কার্য্যটা নিতান্ত সামাজিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। সে সুকুমারীকে সঙ্গে আনিলে ততটা দোষের কারণ হইত না। কিন্তু সুকুমারী আসিতে পারিত না। সুকুমারী বুঝিয়াছিল যে ডাঃ বসুর সম্মুখীন হইয়া কথা কহিয়া বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা চলিবে না ; তাই সে সখী প্রাণতোষিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে পত্রের দ্বারা ডাঃ বসুকে কথাটা জানাইবে। পত্রখানা ডাকে বা বাহকের হস্তে পাঠান যাইতে পারা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে পত্রখানা ঠিক ডাঃ বসুর হস্তগত হইল কি না, সুকুমারী তাহা নিশ্চতরূপে জানিতে পারে না। অতএব স্থির হইয়াছিল যে ডাঃ বসুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রাণতোষিণী পত্রখানা তাঁহাকে স্বহস্তে প্রদান করিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাঃ বসুর সহিত দুই দিন তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সুতরাং পত্রখানি তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।

আজ প্রাণতোষিণী প্রস্তাব করিল, "চল্, তোতে আমাতে গিয়ে পত্রখানা ডাক্তারের বাড়ীতে দিয়ে আসি।" কিন্তু সুকুমারী আপন পত্রবাহিকা হইয়া আপনি যাইতে পারে না। কাযেই তাহার আসা হইল না। প্রাণতোষিণী একাই আসিল। প্রাণতোষিণী ভাবিয়াছিল, ঐ ডাক্তারটার বাটীতে যাইব, তাহাতে আর দোষ কোথায়? লোক মনে করিবে আমার ব্যারাম হইয়াছে; তাই দেখাইতে গিয়াছিলাম।—তা সত্যিই ত আমার ব্যারাম—বড্ড ব্যারাম হইয়াছে। দেখ না আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে।

পত্রবাহিকা হইয়া ডাঃ বসুর বাটীতে আসায় প্রাণতোষিণীর যে কোনও স্বার্থ ছিল না, এমন কথা আমরা বলি না। বলিলেও আমার বিদুষী ও বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ আমার কথায় আস্থা স্থাপন করিবেন না। আসল কথাটা এই যে, সত্যই তাহার মনটা বড়ই ধড়ফড় করিতেছিল। দুই দিন ডাক্তার বসুকে না দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, পৃথিবী যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দুই দিন তাঁহার কথা না শুনিয়া তাহার কাণে তালা লাগিয়াছিল; দুই দিন তাহার সহিত কথা না কহিয়া বর্ষার কোকিলের ন্যায় স্বরভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তাই কথা কহিতে, কথা শুনিতে, দেখিতে সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ডাঃ বসুর বাটীটা তাহার ভবিষ্যৎ বাসের যোগ্য হইবে কি না, তাহা জানিবার ইচ্ছাও বোধ হয় তাহার মনোমধ্যে একটু স্থানলাভ করিয়াছিল।

অতএব প্রাণতোষিণী তিনটি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ডাঃ বসুর

বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার প্রথম উদ্দেশ্য সুকুমারীর বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাহারের পত্রখানি স্বহস্তে ডাঃ বসুর হস্তে প্রদান করা; তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতুকময় রহস্যের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করা; তাহার তৃতীয় গোপন উদ্দেশ্য, দুই দিন পরে আবার ডাক্তার বসুকে দেখা, এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করা, অধিকন্তু তাঁহার গৃহটি পরিদর্শন করা। এই তিনটি সাধু অভিপ্রায় লইয়া সে ডাঃ বসুর বাটীর হল-কামরায় প্রবেশ করিয়া হাঁকিল,—"বেয়ারা!"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহ পরিদর্শন।

ডাঃ প্রাণকান্ত বসু পোষাক কামরা হইতে, হাতমুখ ধুইবার জন্য, তৎসংলগ্ন স্নানাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে প্রাণতোষিণীর ডাক শুনিলেন। কিন্তু সেটা কাহার আহ্বান, তিনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি জনান্তিকে থাকিয়া আগন্তুকের আহ্বানের উত্তর দিলেন, —"এখানে বেয়ারা ফেয়ারা নেই—বোধহয়, আপনার ঘরের কোণে বসে সিদ্ধি খাবার উদ্যোগ করছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি। কে আপনি?"

প্রাণতোষিণী আপনার পরিচয় প্রদান করিল না। কেবল কৌতুক করিয়া কহিল, "আমার মিষ্টি স্বর শুনে বুঝতে পারছেন না, কে আমি?'

ডাঃ বসু পূর্ব্ববৎ ভিতর হইতে কহিলেন, "অপনার স্বর মিষ্টি বটে। আপনি কোনও বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা তা বুঝতে পারছি। আপনি একটু বসুন। আমার দেরী হবে না। আপনার কি প্রয়োজন?"

প্রাণতোষিণী কহিল, "আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমার প্রয়োজনটা কি তা আপনাকে জানাবো। এখন আপনার উপদেশ

মত আমি একটু বসি।”—এই বলিয়া প্রাণতোষিণী নিকটবর্ত্তী আসনে উপবেশন করিল; তাহার উপবিষ্ট মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল যেন দেবী জগদ্ধাত্রী সিংহবাহন ত্যাগ করিয়া চর্ম্মাবৃত সামান্য কাষ্ঠাসনে আসিয়া বসিলেন, ইন্দ্রাণী যেন নন্দন ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া প্রবালবেদিকায় উপবেশন করিলেন, ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যেন ইষ্টদেবী আবির্ভূতা হইয়া, ভক্তের প্রতিষ্ঠিত সামান্য আসনে উপবেশন করিলেন।

প্রসাধন সমাপনান্তে সুসংস্কৃত বেশ পরিধান করিয়া প্রায় পনেরো মিনিট পরে বাহিরে আসিয়া ডাঃ বসু দেবীপ্রতিমাতুল্য সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিলেন, সেই অলোকসামান্য রূপালোক দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন।—তাহার মনে বুঝি সেই অপূর্ব্বমূর্ত্তির পদতলে পড়িয়া পূজা করিবার বাসনা জন্মিল।

প্রাণতোষিণীও তাঁহাকে দেখিল; দুইদিনের অদর্শনের বুভুক্ষা লইয়া দেখিল। সদ্যোধৌত মর্ম্মরফলকের ন্যায় তাঁহার প্রসাধনপূত প্রতিভাপ্রোজ্জ্বল, প্রশস্ত ললাট দেখিল। তাঁহার সুসঙ্গত পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া তাঁহার দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ অবয়বের যে দীপ্তি বাহির হইতেছিল, তাহা সে মুগ্ধ নেত্রে লক্ষ্য করিল। ভাবিল, হাঁ, কর্কশ পুরুষজাতির মধ্যেও সৌন্দর্য্য থাকে বটে; কেবল স্বচ্ছ ও তরলকায়া নগনন্দিনী সকলই সুন্দরী নহে, নগরাজের পাষাণ অবয়বেও যথেষ্ট সৌন্দর্য্যের বিকাশ থাকে। এই প্রাণকান্ত সত্যই তাহার প্রাণকান্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মরি, মরি! ডাঃ বসুর কি প্রশস্ত বক্ষঃ! কবে প্রাণতোষিণী সেই বক্ষে আপন পুষ্পমালাতুল্য ললিত দেহ

বিলম্বিত করিয়া দিতে পারিবে? কবে তাঁহার পৃথুল গ্রীবা তাহার বাহুলতার অবলম্বন হইবে? কবে ঐ কৃষ্ণশ্মশ্রুশোভিত ওষ্ঠ মধু-পানরত ভ্রমরের মত তাহার কোকনদ-কোরক-তুল্য অধরে আসিয়া বসিবে? সেই শুভক্ষণের প্রত্যাশায় প্রাণতোষিণীর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল পরে ডাঃ বসু চেতনা প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার মৌন-মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল; তিনি বিস্ময়বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে? আমার বাড়ীতে?"

প্রাণতোষিণী ডাঃ বসুর কণ্ঠস্বরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, "কেন, আপনার বাড়ীতে কি আসতে নেই? এতে আপনার কি কোনও আপত্তি আছে?"

ডাঃ বসু। আপত্তি? আমার?

প্রাণতোষিণী। বোধহয় আপন পত্নীর প্রবেশের আগে, অপর কোনও স্ত্রীকে আপনার বাড়ীতে আসতে দিতে আপনার আপত্তি থাকতে পারে।

ডাঃ বসু। না, না, আমার কিছুই আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু—কিন্তু, এই এক ক্রোশ পথ তফাতে আমার বাড়ীতে আপনি পথ চিনে এলেন কেমন করে?

প্রাণতোষিণী। দেখলাম, এখানকার গাড়োয়ানরা আপনাকে আর আপনার বাড়ীটাকে খুব চেনে। বলবা মাত্রঠিক আপনার বাড়ীর গেটেই নামিয়ে দিলে। গাড়ী থেকে ভাবলাম যে কখন এতটা এসেছি, তখন বাড়ীটা একবার ভাল করে দেখে যেতে হবে।

মানুষটাকে যখন বেশ চিনেছি, তখন তাঁর বাড়ীটাও চিনে রাখা দরকার। তাই এলাম।

ডাঃ বসু। বেশ করেছেন।

প্রাণতোষিণী। এখন যদি আমি আপনার বাড়ীর প্রত্যেক ঘরটি দেখি, তা হলে বোধ হয় আপনি তাতে বাধা দেবেন না?

ডাঃ বসু। আপনাকে আমি বাধা দেবো? কিন্তু জানেনই ত আমার গৃহিণীশূন্য গৃহ; এখানে যদি কিছু অগোছাল বা অপ্রীতিকর দেখেন, তা হলে যেন বিরক্ত হবেন না।

প্রাণতোষিণী। ভগবান আমাদের এমন করে সৃষ্টি করেছেন, যে আমরা কিছু অগোছাল দেখলে সত্যিই বিরক্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু আপনার ভয় নেই। আপনারা বলেন, আপনার বাড়ীর সুমুখ, আপনার এই হলঘর যা দেখেছি, তাতে মনে হয় না যে, আপনার কোথায় কিছু অগোছাল আছে। আর যদি কিছু দৈবাৎ অগোছাল থাকে, আমি তা গুছিয়ে দেবো। আহা! অগোছালটি গুছিয়ে দেবার জন্যে এখনও ত আপনি বাড়ীতে একটি আপনার লোক আনতে পারেন নি। চলুন, চলুন, আপনার কোথায় কি অগোছাল আছে গুছিয়ে দিয়ে আসি।

এই বলিয়া প্রাণতোষিণী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং আপনি অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, কক্ষের পর কক্ষ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। কক্ষ গাত্রে কোথায় কোন ছবিটি কি ভাবে লম্বিত আছে, কোথায় কোন দর্পণটি স্থাপিত আছে, কোথায় কোন কোণে, কোন আসবাবটি রক্ষিত হইয়াছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে,

সে যেন তাহা নখ দর্পণে আঁকিয়া লইল। কোথায় কোনও কুসুমা-ধারটি ঈষৎ স্থান ভ্রষ্ট দেখিয়া, সে তাহা সরাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিল ; কোথায় কোনও গৃহ-সজ্জায় সামান্য ধূলি সঞ্চয় দেখিয়া, সে আপন তুষার শুভ্র রুমাল বাহির করিয়া তাহা যত্নে মার্জ্জিত করিল। তাহার কার্য্য কলাপ দেখিলে বাহিরের লোক মনে করিত, সে যেন আপনারই গৃহে আপনারই জিনিষগুলির যত্ন করিয়া বেড়াইতেছে।

ডাঃ বসু যন্ত্রচালিতের ন্যায় নীরবে প্রাণতোষিণীর পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন। সে একটি কক্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন, "ও ঘরে ঢ়ুকবেন না ; ওটা আমার ড্রেসিংরুম।"

প্রাণতোষিণী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাতে দোষ কি ? আমার দাদার ড্রেসিংরুমে ঢ়ুকে দেখেছি যে, তাতে অনেক সময় চুরুটের ছাই আর হুইস্কির খালি বোতল পড়ে থাকতো। আপনার ড্রেসিংরুমেও কি অনেক চুরুটের ছাই আর হুইস্কির বোতল আছে ?"

ডাঃ বসু। না, তা নয় ; হুইস্কি বা চুরুট আমি খাইনে।

প্রাণতোষিণী। তবে বোধ হয়, ড্রেসিং টেবিলের উপর কোনও বিলাতী সুন্দরীর ফটোগ্রাফ রেখেছেন, আমি সুকুমারীর সই বলে, আমাকে তা দেখাতে চান না।

ডাঃ বসু। যার ফটোগ্রাফ ঘরে রাখতে ইচ্ছা করে, এমন সুন্দরী আমি বিলাতে দেখতে পাই নি।

প্রাণতোষিণী। তবে ?

ডাঃ বসু। বেহারা, বোধ হয়, ছাড়া কাপড় চোপড়গুলা এখনও গুছিয়ে রাখে নি, সে গুলা আপনার চোখে পড়লে আপনার ঘৃণা হবে।

প্রাণতোষিণী। আমার স্নায়ুটা তত দুর্ব্বল নয়। তবু আপনার বাড়ীতে আপনার অবাধ্য হয়ে চলা ভাল দেখাবে না; কেমন? চলুন অন্য ঘরে যাই।

ডাঃ বসু। এই পাশের এই তিনটে ঘর আমি আমার স্ত্রীর জন্যে সাজিয়ে রেখেছি। তিনি এসে পুরুষমানুষের এই সাজানটা পছন্দ করবেন কি না বলতে পারিনে। আপনি দেখে বলবেন, কিছু পরিবর্ত্তনের দরকার হবে কি না।

সেই কক্ষ কয়েকটা পরিদর্শন করিতে যাইয়া প্রাণতোষিণী বড় অদ্ভুত ব্যবহার করিল। প্রশস্ত প্রসাধন কক্ষে যাইয়া, শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রসাধন টেবিলের নিকটে দাঁড়াইয়া বৃহৎ দর্পণে আপন মুখ দেখিল; নির্ম্মল ললাটে একটি অলকগুচ্ছ স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, রৌপ্যমণ্ডিত বুরুসের দ্বারা সে তাহা সযত্নে সংযত করিয়া লইল। দর্পণ পার্শ্বস্থ ধাতুময় শৃঙ্গ হইতে তোয়ালে লইয়া আপন অনিন্দ্য মুখমণ্ডল মার্জ্জিত করিল;—শ্বেত সরসিজ যেন শ্বেত সূর্য্যকিরণে আপন কমল মুখ মুছিল। করপদ্ম তুলিয়া প্রাণতোষিণী আপন প্রকোষ্ঠ-নিবদ্ধ রত্নখচিত কনককঙ্কণটি ঘুরাইয়া তোয়ালেতে মুছিয়া লইল। ঐ টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বে কয়েকটি স্ফটিক নির্ম্মিত বিচিত্র পাত্রে নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য রক্ষিত ছিল; তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া একটি গন্ধপাত্র লইয়া, প্রাণ-

তোষিণী কয়েক বিন্দু গন্ধদ্রব্য আপন রুমালে ঢালিয়া লইল। নিকটবর্ত্তী একটা আসনে উপবেশন করিয়া পাদুকা পরিষ্কারক বুরুসের দ্বারা আপনার ক্ষুদ্র পাদুকাদ্বয় ঝাড়িয়া লইল। অতঃপর প্রাণতোষিণী বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে সুকোমল গালিচার উপর মনোজ্ঞ ও সুগঠিত ও বিচিত্র আসন সকল, মর্ম্মর ফলকাচ্ছাদিত বিভিন্নাকার টেবিল ও টিপয় সকল সজ্জিত ছিল; এতদ্ব্যতীত কক্ষের এক কোণে একটি পিয়ানো এবং অন্য এক কোণে মেহগ্নি কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর লিখনোপকরণ সকল রক্ষিত ছিল। প্রাণতোষিণী 'পয়োনার নিকটে যাইয়া তাহার আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া তাহার গজদন্ত নির্ম্মিত অঙ্গুলি ফলক ,সকলের উপর আপন চম্পককলি সদৃশ অঙ্গুলি সকল সঞ্চালিত করিল; কক্ষ মধ্যে সপ্তসুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল;—স্বর্গলোকে ইন্দ্রসভায় যেন অপ্সরোগণ রত্ন নূপুর পরিয়া নাচিয়া উঠিল। সে কক্ষের অন্য কোণের টেবিলের নিকটে যাইয়া, তাহার সম্মুখস্থ চর্ম্মমণ্ডিত কোমল আসনে বসিয়া, এক খণ্ড কাগজ লইয়া বড় বড় অক্ষরে আপনার নাম লিখিল। তাহার পর ডাঃ বসুর দিকে চাহিয়া, নয়ন ভঙ্গিমা করিয়া, হাসিয়া কহিল, "সত্যই যদি আপনার মত দুরদৃষ্ট লোকের অদৃষ্টে কখনও পত্নীলাভ ঘটে, তা হলে সে এসে এই নাম দেখে বুঝবে যে, তার আগে এখানে প্রাণতোষিণী বলে এক সুন্দরীর গতিবিধি ছিল।"

ডাঃ বসু সভয়ে কহিলেন,—"কিন্তু ঐ কাগজ যদি আমি ছিঁড়ে ফেলে দিই ?"

প্রাণতোষিণী তাহার বিশাল নয়নের উন্মাদকর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে নিতান্ত বিহ্বল করিয়া কহিল, "প্রাণতোষিণীর নাম আপনি কখনও ছিঁড়ে ফেলতে পারবেন, প্রাণকান্ত বাবু?—ঐ দেখুন, আপনাকে আবার প্রাণকান্ত বলে ফেলেছি; আমার ভারি অন্যায় কিন্তু।

তুলসী কাষ্ঠের মালা লইয়া, গণিয়া প্রাণতোষিণী যদি সে নাম লক্ষবার জপ করিত, তাহা হইলেই ডাঃ বসুর নিকট তাহা কিছু মাত্র অন্যায় মনে হইত না। আর ইহাও ধ্রুব সত্য যে প্রাণতোষিণীর নামাঙ্কিত সেই কাগজ খানা তিনি কখনই ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিতেন না, বরং উহা রক্ষাকবচের ন্যায়, রত্নময় মাদুলীর মধ্যে পুরিয়া কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ডাঃ বসুর বক্ষের মধ্যে ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি সেই গোলমালে পড়িয়া প্রাণতোষিণীর কথায় কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না; কেবল বিহ্বলনেত্রে নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। হায় হায়! এই চপলার চপলাঘাততুল্য কটাক্ষাঘাতে ডাঃ বসুর বক্ষঃ সম্পূর্ণ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভীষ্মের অন্তিম শরশয্যার পার্শ্বে, সব্যসাচীর নারাচাঘাতে বিদ্ধা মেদিনীর বক্ষঃ হইতে যেমন ভোগবতীর পূতধারা উত্থিত হইয়াছিল, ডাঃ বসুর সেই কটাক্ষবিদ্ধ বক্ষঃ হইতে তেমনই প্রেমের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরনিহিত চিরকালের নারীবিদ্রোহ শারদীয় প্রতিমার পদতলস্থিত সিংহের ন্যায় নারীপদতলে লুটাইয়া পড়িল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

শয়ন-কক্ষে।

ডাঃ বসুর ভাবী পত্নীর শয়নকক্ষে যাইয়া প্রাণতোষিণী স্বহস্তে পূর্ব্বদিকের বৃহৎ গবাক্ষ খুলিয়া দিল। স্নিগ্ধ সাগর বায়ু গবাক্ষ-পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্পপরিমল মাখিয়া, তাহার চূর্ণ কুন্তলের সহিত তাহার শিথিল বসন প্রান্তের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। সমুদ্রের কল্লোল রব, জলদেবীগণের ঘুম পাড়ান গানের মত, তাহার কর্ণে আসিয়া ধ্বনিত হইল। আহা! কি মধুর! সে ফিরিয়া পরিমার্জ্জিত পিত্তলনির্ম্মিত বৃহৎ খট্টাঙ্গ দেখিল; সেই পিত্তল তাহার প্রেমপূর্ণ চক্ষে সুবর্ণের শ্রীধারণ করিল। খট্টাঙ্গের উপর বিস্তৃত শুভ্র কোমল শয্যা দেখিয়া সে মনে করিল যে, তাহারই জন্য শুভ্র সদ্যঃস্ফুট মল্লিকারাশি দিয়া যেন পুষ্পময় বাসরশয্যা রচিত হইয়াছে। সে সেই শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিল, "আপনি কিছু মনে করবেন না, প্রাণকান্ত বাবু; আমি এই নরম বিছনাটায় শুয়ে একটু সমুদ্রের ঘুমপাড়ান গান শুনবো। বিধাতার কৃপায় যদি আপনার কখন বিয়ে হয়, তাহলে এ ঘরে শোবার অধিকার আমি আর কখন পাব না। তাই আজ এই পরম সৌভাগ্যটা একটু উপভোগ করে নিতে চাই।"

চপলার এই অভিনব প্রস্তাব শুনিয়া ডাঃ বসু কহিলেন,

"বেশ ত, আপনি ঐ খানে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে দিন। আমি ততক্ষণ দু'একজন রোগীকে দেখে আসি।"

প্রাণতোষিণী আর বাক্যব্যয় না করিয়া, কোমল উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া আপন সুকোমল দেহ শয্যায় লুটাইয়া দিল। —মরি! মরি! পুষ্পবিরচিত আধারে কে যেন রত্নমালা লম্বিত করিয়া দিল; জ্যোৎস্না যেন ক্ষীরোদসমুদ্রের বক্ষে আপন শিথিল অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া শুইয়া উড়িল; সরোজিনী যেন অন্য শ্বেত সরোজের বক্ষে ঢলিয়া পড়িল।

পাত্রপূর্ণ ক্ষীরের উপর রসগোল্লার মত রসভরা সেই বরদেহ অবলোকন করিয়া, ডাঃ বসুর মস্তক, বিকারগ্রস্ত রোগীর মস্তকের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে, আর এক মুহূর্ত্ত কাল সেই কক্ষে অবস্থিতি করিলে, আত্মদমন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।' তিনি সত্বর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আপনি শুয়ে থাকুন। আমি দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।"

প্রাণতোষিণী তাহার পদ্মপলাশসদৃশ অর্দ্ধনিমীলিত নয়নদ্বয় হইতে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "না, আজ আর আপনি রোগী দেখতে যেতে পাবেন না! আজ একা আমিই আপনার রোগী; আমার শক্ত রোগ, তার বিবরণ আমি পরে আপনাকে বলবো। এখন আপনাকে অনেক অন্য কথা বলবার আছে। আপনি ঐ চেয়ারখানা এই বিছানার কাছে টেনে এনে বসুন, আমি কথাগুলা আপনাকে বলি।"

"কি কথা ?"

"আপনি বসুন, তারপর বলবো।"

প্রাণতোষিণীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা চলে না। তাহা রাজাজ্ঞার ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। ডাঃ বসু দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া একটা আসন টানিয়া লইয়া, তাহাতে উপবেশন করিলেন।

তখন প্রাণতোষিণী কহিল, "আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, সুকুমারীর সঙ্গে আপনার কখনও বিয়ে হবে না।—কৈ, এই নিদারুণ সংবাদ শুনে ত আপনি কেঁদে উঠলেন না ? চোখের জল ত দূরের কথা, একটি দীর্ঘনিশ্বাসও ফেল্‌লেন না !"

ডাঃ বসু সত্যই দুঃখিত হন নাই—তোমরা জান—দুঃখিত হইবার কোনও কারণই ছিল না। তিনি বলিলেন, "কেন বিয়ে হবে না ? আপনি ত জানেন, আগামী পয়লা জানুয়ারী সুকুমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।"

প্রাণতোষিণী ডাঃ বসুর দীর্ঘদেহের দিকে আগ্রহভরা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আপনার মত বেজায় লম্বা পুরুষ মানুষকে সুকুমারী প্রাণ গেলেও বিয়ে করবে না। আপনি যদি জোর করে তাকে বিয়ে করতে চান, সে ডলফিনিস্ নোজ (Dolphin's nose) থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে।"

ডাঃ বসু হাসিয়া কহিলেন, "কেন ? আমি লম্বা হলেও সে আমাকে ভালবাসে ; সে কথা সে নিজে মুখে বলেছে। আর বিয়েতে সম্মতিও দিয়েছে। আর তাদের বাড়ীতে বিয়ের উদ্যোগটাও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।"

প্রাণতোষিণী কহিল, "অন্যান্য পুরুষদের মত, আপনিও, দেখছি, আমাদের হৃদয়তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শুনুন, আমি সুকুকে ছেলেবেলা থেকে জানি; তার মন আমি যেমন বুঝব তেমন আর কেউ বুঝবে না। আমি বেশ বুঝেছি, সে আপনাকে একটুও ভালবাসে না। তার মাথার এক গাছা ছেঁড়া চুলের উপর তার যে ভালবাসা আছে, আপনার প্রতি তার ততটুকু ভালবাসাও নেই। এখনও স্বামীর প্রতি ভালবাসায় তার সমস্ত বুকটা ভরা আছে; সেখানে আপনার লম্বা দেহ দূরের কথা, একটি আলপিন রাখবারও স্থান নেই। সে যে আপনাকে ভালবাসি বলেছিল, তার কারণ আছে। আপনার মিষ্টি কথার কুহক জালে পড়ে, ক্ষণিক উত্তেজনার ফলে, সে বন্ধুত্বের ভালবাসাটাকে প্রেম মনে করেছিল। আর সম্মতি?—সম্মতি সে দেয় নি। আপনি ধূর্ত্ত লোক, কৌশলে তা আদায় করেছিলেন। এ জন্তে আমরা দুজনে মিলে, বিয়ের উদ্যোগটা বেশী দূর অগ্রসর হতে দিই নি।"

ডাঃ বসু হাসিয়া কহিলেন, "আপনার কথা যদি আমি বিশ্বাস না করি?"

প্রাণতোষিণীও হাসিল; সে বড় ভয়ানক হাসি!—সে হাসি দেখিয়া ডাঃ বসু সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সে হাসিয়া বলিল, "আমার কথা অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আপনার আছে কি, প্রাণকান্ত বাবু?"

ডাঃ বসু বিহ্বল নেত্রে কহিলেন, "আপনি সত্যি বলেছেন, আপনার কথা অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

প্রাণতোষিণী ঃ তবু আমার কথা যে সত্যি, তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেব। সুকু যে আপনাকে বিয়ে করতে চায় না, তার দুটো প্রমাণ আমার কাছে আছে। এ সম্বন্ধে সে আপনাকে যে চিঠি লিখেছে, তা আমি আপনাকে দেব। আপনি —এখন নয়—সময় মত তা পড়ে দেখবেন। আমার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে এই আংটী। এই আংটীটা আপনি সে দিন সুকুর জন্যে রেখে এসেছিলেন। সে এটা স্পর্শও করে নি। আপনার দেওয়া আংটী কেউ না নিলে, পাছে আপনি দুঃখিত হন, তাই আমি এটা পরেছি? এই দেখুন, আমার হাতে কি এটা বেমানান হয়েছে?"

এই বলিয়া প্রাণতোষিণী আপন ললিত বাহুটি ডাঃ বসুর দিকে প্রসারিত করিয়া দিল।—দেখ দেখ, যেন লাবণ্যের একটা প্রবাহ তাঁহার দিকে প্রবাহিত হইল। দেবপূজার সময় আরতির পঞ্চপ্রদীপের ন্যায়, তাহার পঞ্চাঙ্গুলি ডাঃ বসুর হৃদয় মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্খ ঘণ্টা রোলে পূজার বাদ্য তাহার হৃদয় মধ্যে বাজিয়া উঠিল। পূজার মন্ত্রের ন্যায় প্রাণতোষিণী বলিয়া যাইতে লাগিল, "সুকুমারীর সঙ্গে আপনার বিয়ে না হবার আরও কারণ আছে। সে যেমন আপনাকে ভালবাসে না, আপনিও তেমনি তাকে একটুও ভালবাসেন না। আমি জানি, আপনি অন্য একজনকে ভালবাসেন। যাকে ভালবাসেন, তাকে বিয়ে না করে, সুকুমারীকে ভাল না বেসে বিয়ে করলে, আপনি কি জীবনে কখনও সুখ লাভ করতে পারবেন? আপনার জীবনের কোনও

আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হবে? তা ছাড়া, সুকুমারীকে বিয়ে করায় আরও একটা মস্ত বাধা আছে। সুকুমারী না জানুক, কিন্তু আমি জানি যে, মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত এখনও জীবিত আছেন। স্বামী জীবিত থাকতে, আমি জেনে শুনে সুকুমারীর অন্য বিয়ে হতে দিতে পারি নে। পারি কি?”

ডাঃ বসু ভাবিলেন, সর্ব্বনাশ! এই মায়াবিনী তাঁহার হৃদয় নিহিত সমস্ত গুপ্ত কথাই পুনঃ পুনঃ অধীত পুস্তকের ন্যায় পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকে কে বল্লে যে, সুকুমারীর পূর্ব্ব স্বামী এখনও বেঁচে আছেন?”

প্রাণতোষিণী। কেউ না বল্লেও আমি জানি যে তিনি বেঁচে আছেন। আর আপনিও সেটা বেশ ভাল রকম জানেন।

প্রাণতোষিণীর নিকট মিথ্যা বলিতে ডাঃ বসু আর সাহস করিলেন না;—ইষ্টদেবীর নিকট কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। তিনি অকপট চিত্তে নিজের সমস্ত দুষ্ট মতলব তাহার কাছে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন।

এখন প্রাণতোষিণী সকল কথা বুঝিল। বিবাহে সম্মত হইবার সময়, কেন তিনি সুকুমারীর মুখচুম্বন করেন নাই; আংটী পরাইবার জন্য কেন তিনি সুকুমারীর অঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই; কেন নিভৃতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন নাই;—সকল কথাই প্রাণতোষিণীর মানসনেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠিল। পরস্ত্রীর প্রতি ডাঃ বসুর এই সদাচরণের

কথা ভাবিয়া, তাঁহার প্রতি প্রাণতোষিণীর আন্তরিক শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। দুইটি কোমল বাহুর মালা গাঁথিয়া, তাঁহার চরণদ্বয় বেষ্টন করিয়া আপন হৃদয়ের সমস্ত পূজা ঢালিয়া দিবার জন্যে প্রাণতোষিণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ধন্য! ধন্য তুমি দেব মকরকেতন! আজ তোমার পুষ্পশরাঘাতে প্রাণতোষিণীর প্রাণ সম্পূর্ণ বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাণতোষিণীর গৃহিণীপনা।

একাধিক সহস্র রজনী বলিয়া সচিবসুতা সহারজাদী যে সকল দীর্ঘ ও মনোহর কাহিনী কীর্ত্তিত করিয়াছিলেন, কথিত আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া পারস্যাধিপতি সাহ আরার মন হইতে দৃঢ়বদ্ধ নারীবিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। আজ তেমনই, প্রাণতোষিণীর সরসপ্রবালবিগঠিত মুখবিবর হইতে পীযূষপ্রপাতসম যে কথাগুলি বহির্গত হইতেছিল, তাহাতে ডাঃ বসুর মন হইতে চিরদিনের নারী-বিদ্বেষ ভাসিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইহার জন্য পারস্যপতির ন্যায়, তাঁহাকে একাধিক সহস্র নিশি জাগিয়া থাকিতে হয় নাই। সেই শয্যাবিলম্বিতা সুন্দরী এক দণ্ডে নারীজাতির অক্ষুণ্ণ মহিমা প্রচার করিয়া দিয়াছিল; এক দণ্ডে নারীপ্রেমের অটল বিজয়স্তম্ভ ডাঃ বসুর হৃদয়ের রক্তময় রণক্ষেত্রে স্থাপিত করিয়াছিল। তদ্দণ্ডে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য ডাঃ বসুর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রাণতোষিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ রুদ্র-কান্ত বানার্জ্জি প্রাণতোষিণীর অভিভাবক। অভিভাবকের অনুমতি না লইয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা ভদ্রজনো-চিত হইবে না। অধিকন্তু প্রাণতোষিণীকে আপন নির্জ্জন গৃহে অসহায় অবস্থায় পাইয়া এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপনে একটা কাপুরুষতা

ছিল। এজন্য ডাঃ বসু তৎকালে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিলেন না।

অন্যদিকে প্রাণতোষিণীও আপন বিবাহের কথা সহসা মুখে আনিতে পারিল না। কয়েক দিন পূর্ব্বে সে বক্ষে স্বাধীন হৃদয়ের গর্ব্ব লইয়া সখী সুকুমারীকে বলিয়াছিল যে সে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। আজ সেই শয্যায় শয়ন করিয়া কন্দর্প দেবের কৃপায় সে বুঝিয়াছিল যে, বিপুল প্রেমের অসহনীয় ভারে তাহার নারীহৃদয়ের সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ ডাঃ বসুর নয়ন-তলে শুইয়া সে বুঝিয়াছিল যে, গর্ব্ব নহে, লজ্জাই নারীহৃদয়ের প্রকৃত অলঙ্কার।

উভয়েই কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া উভয়কে দেখিতে লাগিল। বালক যেমন নূতন পুস্তক পাইলে, তাহার পত্রোন্মোচন করিয়া নূতন ছবিটি দেখিয়া লয়, ডাঃ বসুও তেমনই সেই শয্যাবিলম্বিতার দেবীপ্রতিবিম্বসদৃশ অবয়বের সৌন্দর্য্য নবীন আগ্রহ ভরে দেখিতে লাগিলেন। অন্যদিকে, পদ্মিনী যেমন প্রভাত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে, প্রাণতোষিণীও তেমনই একাগ্র নয়নে ডাঃ বসুর প্রসন্ন ললাটের দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে প্রাণতোষিণী আবার কথা কহিল। ডাঃ বসুর হৃদয়ের তার যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল; প্রাণপিঞ্জরে বসন্তের কোকিল যেন কুহরিল।

প্রাণতোষিণী কহিল, "আজ আশা করে এসেছিলাম যে, সুকুমারীকে বিয়ে করার আশা ভগ্ন করে আপনাকে বিলক্ষণ

দুঃখিত করতে পারবো। কিন্তু এখন দেখছি, এতে আপনার দুঃখিত হবার কারণ পূর্ব্বথেকেই ছিল না; আপনি কখনই সুকুমারীকে বিয়ে করতেন না।"

ডাঃ বসু। না, এটা আমার বন্ধুকে শিক্ষা দিবার জন্যে একটা তামাসা মাত্র। কিন্তু এই তামাসাটা আমার পক্ষে ভয়ানক অন্যায় কাষ হয়েছে। কোনও পতিব্রতার পবিত্র প্রেম নিয়ে তামাসা করা চলে না।

প্রাণ। না, আমাদের ভালবাসাটা ভালবাসার জিনিষ নয়। এখন বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে, আপনার মত লম্বা, সজীব, সুন্দর ও নবীন স্বামী লাভ করবার সম্ভাবনা থাকলেও, মেয়েমানুষরা মরা স্বামীকে ভুলতে পারে না।

ডাঃ বসু। তা খুব বুঝেছি। আর বুঝতে পেরেছি বলে, আগে যা কখনও আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, আমার তাই ঘটেছে। —এখন আপনাদের জাতটার প্রতি আমার মনে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মেছে।

প্রাণ। আমাদের প্রতি আপনার কতটা ভক্তি জন্মেছে, তা পরে বুঝতে পারবো। আপাততঃ আমি এই নরম বিছানাটা ছেড়ে আপনার সঙ্গে খানার ঘরে যাব। সে ঘরটা এখনও দেখা হয়নি।

সুন্দরীর সেই শায়িত অবয়ব, ডাঃ বসুর চক্ষে, প্রেমনদীর তরঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহার মনটা তাহাতে পূজার পুষ্পের ন্যায় কখনও ভাসিতেছিল, কখনও ডুবিতেছিব।

তিনি মনে করিলেন, প্রাণতোষিণী যদি তাহার বিস্তৃতসৌন্দর্য্য গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে, তাঁহার মনটা রূপতরঙ্গের সন্তাড়নে আর হাবুডাবু খাইবে না। তাই তিনি প্রাণতোষিণীর প্রস্তাব শুনিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "চলুন, চলুন খানাকামরায় যাই।"

প্রাণতোষিণী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আর দেখুন প্রাণকান্তবাবু, যদি আপনার খানাকামরায় কোন খাবার জিনিষ থাকে, আর সেই খাবার জিনিষ যদি আমি কিছু খেয়ে ফেলি, আপনি কিছু মনে করবেন না।" এই বলিয়া প্রাণতোষিণী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাঃ বসু প্রাণতোষিণীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া ভোজনাগারে আসিলেন।

সেখানে কাহারও অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়া, প্রাণতোষিণী বেহারাকে আহ্বান করিল; এবং গরম জল আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিল। এবং স্বয়ং, কাবার্ড হইতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া কক্ষমধ্যস্থিত শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত টেবিলটি সজ্জিত করিল। এবং টেবিলের পার্শ্বের একটি আসন গ্রহণ করিয়া ডাঃ বসুর দিকে হাস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "বসুন, আপনাকে এক পেয়ালা চা তৈরী করে খাওয়াব।—আপনার এই সুন্দর গৃহে গৃহিণীপনা করার সখটা একদিন ভোগ করা যাক। মনে রাখবেন, এটা সত্যি গৃহিণীপনা নয়; এটা গৃহিণীপনার অভিনয় মাত্র। আপনি যেমন সুকুমারীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিলেন, আমিও তেমনই

আপনার সঙ্গে গৃহিণীপনার অভিনয় করছি।" চায়ের পেয়ালায় চা পূর্ণ করিয়া তাহা ডাঃ বসুর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া এবং কেকের পাত্রটি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া, সে আবার কহিল, "কেমন, অভিনয়টা কেমন লাগছে?"

কিছুমাত্র বাধ বাধ ভাব না দেখাইয়া, প্রাণতোষিণী অতি সহজ ভাবে প্রত্যেক কার্য্যটি সম্পন্ন করিতেছিল। তাহার অবাধ ও সহজ কার্য্য পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া ডাঃ বসু হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে সেটা অবাস্তব অভিনয় বা বাস্তব জীবনলীলা। প্রাণতোষিণীর আহ্বানে তিনি কিছু চেতনা লাভ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন; এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এমন গৃহিণী যদি সত্যিই লাভ করতে পারতাম?"

প্রাণতোষিণী। আমার মত সাগরসেঁচা গৃহিণীরত্ন লাভ করতে হলে তপস্যা করতে হয়। আপনি কখনও গৃহিণী লাভ করবার জন্যে তপস্যা করেছেন, প্রাণকান্ত বাবু?

ডাঃ বসু। কি তপস্যা করতে হবে, প্রাণতোষিণী?

প্রাণতোষিণী। আমার দাদা রুদ্রকান্ত বাঁড়ুয্যেকে পত্র লিখতে হবে, প্রাণকান্ত!

ডাঃ বসু। পত্র নয়, এখানে আসবার জন্যে, সকল কথা ব'লে আমি তাঁকে এখনই টেলিগ্রাফ করবো। চল, প্রাণতোষিণী, টেলিগ্রামটা লিখিগে। ব'লো, প্রাণতোষিণী, সত্যি তুমি আমার—আমার হ'লে?

প্রাণতোষিণী। হলাম বই কি! তুমি আমাকে বলবার অনেক আগেই তোমার হয়েছিলাম।

অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা তোমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবে। এ জন্য আমরা তাহার বর্ণনায় বিরত রহিলাম।

দুই দিন বাদে মিঃ রুদ্রকান্ত বানাজি ডাঃ বসুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে প্রাণতোষিণী উপস্থিত ছিল; সে গৃহিণী হইবার আগেই গৃহিণীপনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া মিঃ রুদ্রকান্ত কহিলেন, "কিরে, তোষিণী, তুই যে বলতিস্ এই পৃথিবীর লোককে তুই বিয়ে করবিনে? এখন এ কি হলো?"

প্রাণতোষিণী অকুণ্ঠ কণ্ঠে উত্তর করিল, "দেখলাম, এ পৃথিবীর সবাই রুদ্রকান্ত নয়, একজন প্রাণকান্তও আছে। তাই বিয়ে করতে হলো। আর বেচারা গৃহিণীর জন্যে ঘরদ্বার গুছিয়ে রেখেছিল, অথচ গৃহিণীর সন্ধান পাচ্ছিল না; তাই দুঃখ হলো। তুমি ত, দাদা, অনেকবার বলেছ যে, সকল ধার্ম্মিক লোকই পরদুঃখে কাতর হন।"

মিঃ রুদ্রকান্ত প্রস্তাব করিলেন যে, কলিকাতায় যাইয়া পক্ষকাল পরে কিছু ধুমধামের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু প্রাণতোষিণী ভাবিল, ওরে বাপরে! এই পনেরো দিন দেরী কি সহ্য করিতে পারা যায়? সে কৌশল করিয়া মুখে বলিল, "দাদা, এবার ১লা পৌষ অগস্ত্য যাত্রা করে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। আর আমি চেষ্টা করলেও বাড়ী ফিরতে পারবো না। এই সমুদ্র-

তীরেই থাকতে হবে। শুনেছি চৈতন্যদেব, জগন্নাথ আর সমুদ্র দেখে, আর দেশে ফিরতে পারেন নি। আমিও সমুদ্র দেখেছি; আর—সে ত কাঠের জগন্নাথ—আমি জীবন্ত জগন্নাথকে এখানে দেখেছি। আর আমার দেশে ফেরা হবে না। তুমি কেন মিছি-মিছি দেরী করবে? শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা সেরে দিয়ে চলে যাও। আর ধূমধাম? তাতে যে টাকাটা খরচ করতে, সেটা আমাকে নগদ দিও। আমার নূতন গৃহিণীপনা আরম্ভ করতে কিছু নগদ টাকার দরকার হ'বে।"

ডাঃ বসুও পরামর্শ দিলেন যে বিবাহটাই যখন আসল ব্যাপার, তখন সেটা শীঘ্রই হওয়া চাই। ধূমধামটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার—সেটা বিবাহের পরে বিবেচনা করা যাইবে। স্থির হইল যে ১লা জানুয়ারীই বিবাহ হইবে; এবং ওয়ালটেয়ারে থাকিয়া যতটা ধূম-ধাম করা সম্ভব, ততটা ধূমধাম করা হইবে।

প্রাণতোষিণী মিঃ অরুণোদয় দত্তের বাটীতে ফিরিয়া সুকুমারীকে সংবাদ দিল,—

"সই, পর্শু আমার বিয়ে;
গুণের সাগর আসবে নাগর
টোপর মাথায় দিয়ে।"

আহা! বেচারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে সে বিদুষী ব্রাহ্মিকা, আর ওরকম পচা, বর্ব্বর ও অশ্লীল কবিতা তাহার নব্য সভ্য ও সুশীল মুখে শোভা পায় না।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মিঃ অরুণোদয় দত্তের বিরক্তি ।

ইদানিং মিঃ অরুণোদয় দত্ত দেখিতেন যে, ডাঃ বসু সুকুমারীর সহিত মিলিত না হইয়া এবং কাণের কাছে মুখ আনিয়া অনুচ্চ প্রেম কথা না কহিয়া, অধিকাংশ সময়ই প্রাণতোষিণীর সহিত কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত করিতেন। প্রায়, কেবলমাত্র প্রাণতোষিণীকে লইয়াই, মোটর গাড়ী চড়িয়া বা পদব্রজে সমুদ্র বায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন; সুকুমারীকে কদাচিৎ সঙ্গে লইতেন। আবার পত্নীর মুখে শুনিলেন যে, প্রাণতোষিণী দুই তিন দিন সারা-দিনমানটা ডাঃ বসুর বাটীতে কাটাইয়া দিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের বাটীতে ফিরিয়া আসিত; ডাঃ বসুর বাটীতেই ব্রেকফাষ্ট ও টিফিন খাইত। যৌবনোচ্ছ্বাসময়ী প্রাণতোষিণীর এই বাড়াবাড়িটা প্রবীণ মিঃ দত্তের মোটেই পছন্দ হইল না। তাঁহার বিধবা কন্যার পক্ষে উহা মঙ্গলদায়ক নহে; কারণ, অনেক সময় বিধবার আকর্ষণ অপেক্ষা কুমারীর আকর্ষণ পুরুষদিগের পক্ষে প্রবল হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে এইরূপ রূপবতী ও উচ্ছৃঙ্খল যুবতীকে বাটীতে আহ্বান করিয়া আনায়, এবং তাহাকে অবাধে ভাবী পতির সহিত মিশিতে দেওয়ায়, তিনি মনে মনে কন্যার বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন না। কন্যার এই অবিমৃষ্যকারিতায় ভবিষ্যতে কি কুফল ফলিতে

পারে তাহা ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন। হয়ত শেষ মুহূর্ত্তে বিবাহে একটা বাধা ঘটিতে পারে; হয়ত বিবাহের পর একটা ডাইভোর্স সুটের কারণ জন্মাইতে পারে! যাহা হউক, আপাততঃ ইহার কোনও প্রতিকার করিতে না পারিয়া, তিনি বিবাহ-উৎসবের আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

আজ ৩০শে ডিসেম্বর। আগামী কল্য সন্ধ্যাকালে বিবাহ হইবে। কন্যাকে বিবাহে উপহার দিবার জন্য তিনি কলিকাতা হইতে যে সকল অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা আপন বাক্স হইতে বাহির করিয়া কন্যার হাতে সমর্পণ করিলেন। সুকুমারী তাহা পিতার হস্ত হইতে স্মিতমুখে গ্রহণ করিল; এবং তৎসমুদয় প্রাণতোষিণীর বিবাহে উপহার দিবার জন্য আপন পেটক মধ্যে তুলিয়া রাখিল। সে তখনও জানিতে পারে নাই যে, তাহার স্বামী জীবিত আছেন, এবং প্রাণতোষিণীর ন্যায় তাহারও অলঙ্কার ধারণের প্রয়োজন আছে। মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত তখনও ওয়ালটেয়ারে আসিয়া পৌঁছান নাই বলিয়া, ডাঃ বসু প্রাণতোষিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া সংবাদটা তখনও গোপন রাখিয়াছিলেন। প্রাণতোষিণী মনে করিয়াছিল, তাহার বিবাহের দিনে সখীকে সহসা স্বামীর সহিত মিলিত করিয়া, আপনার আনন্দের সহিত তাহাকেও একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দ প্রদান করিবে।

বাহিরের এই সকল তথ্য অনবগত থাকিয়া মিঃ দত্ত বাটীর ভিতরের নানা প্রকার উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন্ ঘরে বিবাহের আসর হইবে, কোন কক্ষে বিবাহের ভোজ দেওয়া

হইবে, কোথায় কোন অতিথি আসিয়া অবস্থিতি করিবেন, কোন ঘরটি কিরূপ ভাবে সজ্জিত করিলে সুন্দর দেখাইবে, কোথায় কত-গুলি আলো জ্বালিতে হইবে, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। অস্থির হউন, কিন্তু বিবাহের উদ্যোগটা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। ইহার জন্য তিনি কন্যাকেই কতকটা দোষী মনে করিলেন; এই ব্যাপারে বৃদ্ধ পিতাকে যতটা সাহায্য করা উচিত ছিল, সুকুমারী তাহার কিছুই করিতেছিল না। তিনি মনে করিলেন যে তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণেও এ বিষয়ে যথেষ্ট ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন। তাঁহাদের উচিত ছিল যে অদ্যই ওয়ালটেয়ারে আসিয়া তাঁহার সাহায্য করা। সন্ধ্যা হইতে চলিল, তাঁহারা ত কেহই আসিলেন না।

সত্যই ত, কলিকাতা হইতে কেবল মাত্র একজন আগন্তুক আসিয়াছিলেন। সেদিন আর কেহ আসেন নাই। যিনি আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে চিনি। তিনি সেই প্রেতভয়ে ভীত বাবু নয়নাঞ্জন ভঞ্জ। কন্যার বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য মিঃ দত্ত তাঁহাকে পৃথক্ পত্র লিখিয়াছিলেন; তিনি সেই পত্র পাইয়াই আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য অন্যান্যের ন্যায় তিনিও নিমন্ত্রণের কার্ড পান নাই; তাহা তখনও প্রাণতোষিণীর পেটক মধ্যে নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছিল।

নয়নাঞ্জন বাবুর আগমনের পর, মিঃ দত্ত আপন পাঠাগারে বসিয়া তাহার সহিত কথা বার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার অনুপস্থিতির এই কয় মাসে কলিকাতায় কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে,

নয়নাঞ্জন বাবু তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিবৃত করিতেছিলেন। মিঃ রুদ্রকান্ত বানার্জি আসিয়া, বেহারার নির্দেশ মত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ দত্ত জানিতেন যে মিঃ রুদ্রকান্ত বানার্জিও নিমন্ত্রণের কার্ড পাইয়াছেন। অতএব রুদ্রকান্তকে সমাগত দেখিয়া তিনি সহজেই মনে করিলেন যে, তাঁহারই নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া তিনি ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছেন। তেমন একজন ধনী সন্তানের আগমনে আন্তরিক আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে, তুমি কখন এলে? সব ভাল ত? গাড়ীতে কোনও কষ্ট হয় নি ত? বসো, বসো।"

রুদ্রকান্ত আসন গ্রহণ করিয়া বিনয় সহকারে কহিলেন, "আমি এখানে দুদিন আগে এসেছি। এ দু'দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম বলে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।"

মিঃ দত্ত বিস্মিত হইলেন; প্রশ্ন করিলেন, "দু'দিন আগে? ব্যস্ত? এ দুদিন তুমি কোথায় ছিলে?'

রুদ্রকান্ত। ডাঃ বসু আমাকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন। সেই টেলিগ্রাম পেয়েই আমি এখানে এসেছি; আর তাঁর বাড়ীতেই আছি। আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

মিঃ দত্ত। ওঃ! তাহলে তুমি আমার নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আসনি?

রুদ্রকান্ত। আপনার নিমন্ত্রণ পত্র?

মিঃ দত্ত। তুমি কি ডাক্তার বসুর মুখে শোন নি যে তাঁর

সঙ্গে আমার মেয়ে সুকুমারীর বিয়ে হবে? এই বিয়ের জন্যই ত আমি এই নয়নাঞ্জন বাবুকে, তোমাকে, আর অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুকে নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়েছিলাম।

নয়নাঞ্জন বাবু ও মিঃ রুদ্রকান্ত উভয়েই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া একবাক্যে কহিলেন যে নিমন্ত্রণ কার্ড তাঁহারা পান নাই; এবং তাঁহারা যতদূর অবগত আছেন, তাহাতে তাঁহাদের পরিচিত অপর কোনও ভদ্রব্যক্তি ঐ রূপ কার্ড পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের কথা শুনিয়া মিঃ দত্ত জোরের সহিত বলিলেন যে তাঁহারা নিশ্চয় কার্ড পাইয়াছেন; সুকুমারী নিজে তাহা পাঠাইয়াছে।

মিঃ রুদ্রকান্ত কহিলেন, "সুকুমারীর সঙ্গে ডাঃ বসুর বিয়ে হবে এ রকম কথা ত আমি শুনিনি। আমি জানি, আমার ভগিনী প্রাণতোষিণীর সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হবে। প্রাণতোষিণী আপনার বাড়ীতে বাস করে, এ কথা কি আপনি জানেন না? ডাঃ বসুর বাড়ীতে বিয়ের উদ্যোগ খুব অগ্রসর হয়ে পড়েছে। আমিও তাতেই ব্যস্ত ছিলাম, তাই আমি নিজে এসে আগে আপ-আপনাকে খবর দিতে পারিনি।"

সংবাদটা এখন শ্রবণ করিয়া তিনি যত বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা যদি দুই দিন পূর্ব্বে কর্ণগোচর হইত, মিঃ দত্ত তাহাতে কম বিরক্ত হইতেন না। তিনি মনে করিলেন যে, আজ সকালে যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। এ সমস্তই সুকুমারীর নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। সে যদি প্রাণতোষিণীকে ডাকিয়া না আনিত,

তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই ভয়ানক দুর্ঘটনাটা ঘটিত না। বিবাহে সম্মতি জানাইয়াছিল বলিয়া, একটা দুঃসহ লজ্জায় সুকুমারী কয়েকদিন সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিত। আজ মিঃ দত্ত যেন কন্যার এই বিষন্নতার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন ;—এমন একজন স্বামী করতলগত হইয়াও পুনরায় হস্তচ্যুত হইলে কোন স্বামীহীনা দুঃখিত না হয়? মিঃ দত্ত বুঝিলেন যে তাঁহার পক্ষে এই মহা অপমানটা হাস্যমুখে সহ্য করা ব্যতীত এখন আর অন্য উপায় নাই। পরে ডাঃ বসুর বিপক্ষে একটা ড্যামেজ সুট আনা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও একটা কেলেঙ্কারির ভয় আছে। অতএব তিনি মনের বিরাগ ও বিরক্তি মনোমধ্যে গোপন রাখিয়া মুখে কষ্টহাসি আনিয়া কহিলেন, "তাহলে দেখছি, প্রাণকান্ত এই দুদিনের ভিতর তার মতের পরিবর্ত্তন করেছে। কিন্তু সে কিংবা সুকু কেউ এ পর্য্যন্ত সে কথা আমাকে বলে নি। যা হোক সুকুকে বিয়ে না করে সে যে আমাদের প্রাণতোষিণীকে বিয়ে করছে, এতে আমি আরও সুখী হলাম।"

রুদ্রকান্ত। শুধু সন্তুষ্ট হলে চলবে না। প্রাণতোষিণী আপনার কন্যাস্থানীয়; আর আপনার বাড়ীতেই আছে; তার বিয়েতে সকল কাযের ভার আপনাকেই নিতে হবে। ডাঃ বসুর বাড়ীতে অনেক যায়গা আছে, এজন্যে সেইখানেই বিয়ের উদ্যোগ করেছি। তা না হলে, আপনার বাড়ীতেই বিয়ে হত। ডাঃ বসুর বাড়ীতে কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনাকে যেতে হবে; সে নিজে এসে তার মোটরে আপনাকে নিয়ে যাবে।

মিঃ দত্ত বৃদ্ধত্বের ওজর দেখাইয়া প্রথমে বিবাহ বাড়ীতে যাইতে সম্মত হন নাই। পরে ধনীসন্তান রুদ্রকান্তের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া এবং নয়নাঞ্জন বাবুর উপদেশ লইয়া ডাঃ বসুর বাটীতে যাইতে সম্মত হইলেন।

সেদিন রাত্রিভোজনের পর মিঃ দত্ত সুকুমারীকে নিভৃতে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করিলেন যে, তাহারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এই বাঞ্ছনীয় বিবাহটা ভগ্ন হইয়া গেল। সে যদি প্রাণতোষিণীকে অকারণ আহ্বান করিয়া না আনিত, তাহা হইলে আজ তাহাদিগকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইত না। এখন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ আসিয়া, হাসিয়া ফিরিয়া যাইবেন।

সুকুমারী অবনত মুখে কহিল, "বাবা, আমার পক্ষে এ বিয়ে একটুও সুখকর হত না। আমি নিজের মন বুঝতে না পেরে, ভুলক্রমে সম্মতি দিয়েছিলাম। প্রাণতোষিণী না এলে আমি এই বিপদ থেকে এত সহজে উদ্ধার পেতাম না। আর এ বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে কোনও লোকের কাছে আমরা হাস্যাস্পদ হব না; কারণ কোন লোকই আসবেন না। আমি নিমন্ত্রণের কার্ডগুলো পাঠাই নি।"

সুকুমারীর কথা শুনিয়া মিঃ দত্ত মনোমধ্যে কতকটা শান্তিলাভ করিলেন বটে; কিন্তু তখনও তাঁহার মানসিক বিরক্তি সম্পূর্ণ অপনীত হইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমিক প্রেমিকার বিবাহ ও সখা-সখীর মিলন।

পুষ্পোদ্যান মধ্যে একখণ্ড শষ্পাচ্ছাদিত সমতলক্ষেত্রে বৃহৎ উৎসবমণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। পল্লবপুষ্পে ও উজ্জল আলোক-মালায় তাহা সজ্জিত করা হইয়াছিল। সেখানে ভদ্রগণ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দলে দলে সমাগত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় মিঃ অরুণোদয় দত্ত আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডাঃ বসু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, নিভৃতে বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া কহিলেন, "সুকুমারীকে বিয়ে না করাতে আপনি বোধ হয় আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন; কিন্তু আপনি এ সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎটা শুনলে, আমি নিশ্চয় বলছি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন।" এই বলিয়া তিনি মিঃ নীরদবরণ গুপ্তের জীবন রক্ষার কথা, নিজের নারীবিদ্বেষের কথা, নারী প্রেমের অসারত্ব প্রমাণ করিবার বিফল চেষ্টার কথা, এবং শেষে কিরূপে সুকুমারী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়াছিল, সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। পরিশেষে কহিলেন—"আমি এক-জন ভদ্রমহিলাকে অপদস্থ করবার যে চেষ্টা করেছিলাম, তার জন্যে তাঁর কাছে ত ক্ষমা চাবই—আপনার কাছেও যোড় হাতে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

ডাঃ বসুর কথা শুনিয়া, মিঃ অরুণোদয় দত্ত আপনার মনের সমস্ত অপমান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঝাড়িয়া ফেলিলেন। এবং কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া মনে মনে সমস্ত বিষয়টা আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদবরণ এখন কোথায় ?"

ডাঃ বসু আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "এই বাড়ীতেই আছে। আজ সকালে সে এখানে এসে পৌঁছে। হঠাৎ আপনাদের সঙ্গে দেখা হলে, একটা মহা উত্তেজনায় পাছে কোনও বিপদ আপদ ঘটে, এজন্য আমি এ পর্য্যন্ত তাকে আপনাদের কাছে নিয়ে যাইনি। এখন আপনি আমার কাছে সকল কথা শুনেছেন, এখন সে এসে আপনাকে প্রণাম করবে; এবং আপনাদের দর্শন প্রত্যাশায়, কেমন করে সে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে,... তার কাছে আপনারা তা শুনতে পাবেন।"

মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত অন্য কক্ষ হইতে আসিয়া শ্বশুর মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আর বলা বাহুল্য যে, মিঃ অরুণোদয় দত্ত পুরাতন জামাতাকে লইয়া, নূতন জামাতা না পাওয়ার দুঃখ একেবারে ভুলিয়া গেলেন। শ্বশুর জামাতায় অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। তাহার পর মিঃ দত্ত জামাতাকে লইয়া মহানন্দে বিবাহবাটীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণতোষিণীর বিবাহে, মিঃ রুদ্রকান্তের টেলিগ্রাম পাইয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানিতে পারিলেন যে মিঃ গুপ্ত জীবিত আছেন।

নয়নাঞ্জন বাবুও আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য বিবাহ বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। এতদিন পরে পরব্রহ্মের কৃপায় তাঁহার ভূত-ভয় অপনীত হইল; এবং তিনি সত্যই বুঝিলেন যে সংবাদ পত্রের সংবাদও মিথ্যা হয়। তিনি পুষ্পমালা বিভূষিত উৎসবালোকোজ্জ্বল বিচিত্র মণ্ডপ ছাদের দিকে মুখ তুলিয়া, চশমালঙ্কৃত নয়ন মুদিত করিয়া মনে মনে বলিলেন, 'ও তৎসৎ।'

এই অবসরে ডাঃ বসু প্রাণতোষিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "এইবার আমার সখার সঙ্গে তোমার সখীকে মিলিত করে দাও। পুরাতনের এই মিলন দেখে আমরা নূতন জীবন আরম্ভ করবো। একটা বিষয়ে সাবধান হয়ে কায করতে হবে। তোমার সখীকে আগে থেকে সকল কথা বলে, বেশ করে প্রস্তুত করে রাখবে। তা না করলে, হঠাৎ দেখা হলে হয়ত সে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।"

সুকুমারী ডাঃ বসুর বাটীতে আসিয়া এক নির্জ্জন কক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, প্রাণতোষিণীকে উপহার দিবার জন্য সে আপনার অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিয়াছিল। সেই কক্ষে প্রাণতোষিণীকে সমাগত দেখিয়া সে কহিল, "আয়, তুষি, আজ তোর বিয়ের দিনে তোকে কিছু উপহার দিই।"

প্রাণতোষিণী সুকুমারীর করতল আপন আনন্দস্পন্দিত কর-তল মধ্যে আদরে গ্রহণ করিয়া কহিল, "তোর উপহার পরে নেব এখন। কিন্তু আমি তোকে এমন একটা জিনিষ উপহার দেব যে, আমার এই আনন্দের দিনে আমার চেয়ে তোকে বেশী

সুখী করবো। যার জন্যে তুই আমার বরের মত বরকে বিয়ে করতে চাসনি, তাকে এনে তোর সঙ্গে মিলন ক'রে দেব।"

সুকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি বলছিস, তুষি?"

প্রাণতোষিণী বলিল, "আমি বলছি যে তোর স্বামী মিঃ নীরদবরণ গুপ্ত এখনও জীবিত আছেন। এখন তিনি এই বাড়ীতেই আছেন। আমি এখনই তাঁকে তোর কাছে নিয়ে আসবো।"

প্রাণতোষিণী মনে করিয়াছিল যে, তাহার নিকট হইতে এই অত্যন্ত শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া সখী সুকুমারী অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে সভয়ে দেখিল যে, সুকুমারীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে কার্পেটের উপর শুইয়া পড়িল; তাহার পর, তাহার সংজ্ঞা একবারে বিলুপ্ত হইল। প্রাণতোষিণী বুঝিল যে ডাঃ বসুর উপদেশানুযায়ী সে সম্পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারে নাই; শুভ সংবাদটা আরও একটু কৌশল পূর্ব্বক প্রদান করা উচিত ছিল। এক্ষণে সখীকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া শীঘ্র ডাঃ বসুকে সংবাদ দিল; এবং নিজে তাহার মস্তক আপন ক্রোড়ে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে ডাঃ বসু আসিয়া দেখিলেন যে সুকুমারী জ্ঞানলাভ করিয়াছে, এবং প্রাণতোষিণীর পার্শ্বে একটা মখমল মণ্ডিত আসনের উপর নীরবে অবনত মুখে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি

সুকুমারীকে পরীক্ষা করিয়া প্রাণতোষিণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, —"নাঃ, ভয়ের আর কোনও কারণ নাই। এই বার নীরদকে ডেকে এনে ওর কাছে ছেড়ে দাও। সে এসে আপনার জিনিষ আপনি বুঝে নিক। তাকে বুঝিয়ে দিও যে আমি তার জিনিষের এতটুকুও ভাগ পাইনি।"

অতঃপর তিনি সুকুমারীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "সুকুমারী, নীরদের সঙ্গে আমার যে প্রবাদ, তার জন্যে এখনও তোমাকে আমি মিসেস্ গুপ্ত না বলে, সুকুমারীই বলবো। তুমি নীরদের কাছে সব কথা শুনে, তোমার প্রতি আমার অদ্ভুত আচরণের জন্যে আমাকে ক্ষমা ক'রো। প্রাণতোষিণীর মত উপযুক্ত শিক্ষক না পেলে, আমি তোমাদের জাতের মহিমা কথনই বুঝতে পারতাম না। আমার মনের মধ্যে আমি যে নরকের সৃষ্টি করেছিলাম, তোমরা সেখানে স্বর্গ তৈয়ারী করেছ। সেখানে এখন নন্দনের ফুল ফুটেছে, অপ্সরা নাচছে, কিন্নরীতে গান গাচ্ছে।"

সুকুমারী কোনও কথা কহিল না।

ডাঃ বসু প্রাণতোষিণীর সহিত কক্ষ ত্যাগ করিয়া, সেখানে মিঃ নীরদবরণ গুপ্তকে পাঠাইয়া দিলেন।

উজ্জ্বল দীপালোকে স্বামীকে নিরীক্ষণ করিয়া সুকুমারী ছিন্ন লতার ন্যায়, তাঁহার পদতলে আপনার বরদেহ বিলুণ্ঠিত করিয়া দিল। মিঃ গুপ্ত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া পত্নীকে আপন তপ্ত বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিরহ-

বিশুষ্ক স্বামী-বিরহিণী পত্নীর সহিত গদ্গদ কণ্ঠে কি কথা কহিয়াছিল, কত গাঢ় চুম্বনে কত অধরসুধা পান করিয়াছিল, কত নিবিড় আলিঙ্গনে পরস্পরের উদ্বেলিত অবয়ব নিপীড়িত করিয়াছিল, এবং কেমন করিয়া সেই দীর্ঘ বিরহের অতৃপ্ত তৃষ্ণা পরিতুষ্ট করিয়াছিল, তাহার বিচিত্র বিবরণ লিখিতে হইলে, একটা অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত হইয়া পড়িবে। আমরা দ্বাপর যুগের মহামুনি নহি; আমরা কলির ক্ষীণশক্তি মানব; এই অষ্টাদশ পর্ব্ব নূতন প্রেমের মহাভারত লিখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; এ জন্য আমরা তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। তোমরা বহুদর্শী পাঠক! তোমরা আপন মনে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইও।

কতক্ষণ পরে তাহারা কক্ষের বাহিরে আসিল। প্রাণতোষিণী ছুটিয়া আসিয়া সুকুমারীর হাত ধরিয়া কহিল, "আজ সত্যিই বিধবার বিয়ে হয়েছে। আজ তুই সধবা হ'য়েছিস। আয়, ভাই, এ বিধবার কাপড় ছেড়ে সধবার কাপড় পর। আমি তোর জন্যে সব গুছিয়ে রেখেছি। চল, আমার পোযাক কামরায় চল।"

আমরা সেই প্রাসাধন কক্ষের কথা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। সেই প্রাসাধন কক্ষে যাইয়া প্রাণতোষিণী সুকুমারীকে উৎকৃষ্ট উৎসব সজ্জায় সজ্জিত করিল। তাহাকে উপহার দিবার জন্য সুকুমারী যে অলঙ্কার সকল আনিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি মাত্র নিজের জন্য রাখিয়া, বাকী সমুদয় অলঙ্কার সে সুকুমারীকে পরাইল। তাহার পর আপন বিবাহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সে তাহাকে বাহিরে লইয়া আসিল।

সুকুমারীর মাতা বিবাহ বাটীতে আগমন করেন নাই। জামাতা জীবিত আছেন এই সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্য মিঃ অরুণোদয় দত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া ডাঃ বসু স্বয়ং মোটর চালনা করিয়া তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া আসিলেন। মাতা কন্যাকে সধবার বেশে দেখিয়া বিশেষ প্রীতি-লাভ করিলেন।

তাহার পর সুবৃহৎ, সুসজ্জিত ও বহুবিধ খাদ্যভারে প্রপীড়িত টেবিলের চারি পার্শ্বে বসিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রগণ, বাবু নয়নাঞ্জন ভঞ্জের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া নবদম্পতীর মঙ্গল কামনা করিয়া, বিবাহভোজ উপভোগ করিলেন।

সুকুমারী সেই যে একদিন পরপুরুষকে বিবাহ করিতে সম্মতা হইয়াছিল, এবং তাহাকে ভালবাসি বলিয়াছিল, সে লজ্জা সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারে নাই। তাহার জন্য সে শতবার স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছিল; মিঃ গুপ্তও তাহাকে বারবার বুঝাইয়াছিলেন যে, সে কোনও অন্যায় কার্য্য করে নাই। কিন্তু তাহার হৃদয়মধ্যে সেই দারুণ লজ্জার আগুন কখনই নির্ব্বাপিত হয় নাই। কাহিনী-কথিত রাবণের চিতার ন্যায় সে আগুন চিরদিন জ্বলিয়াছিল।

সমাপ্ত